সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 2 | No. 1 | 1958

Check for updates

'সায়ের' ফকির গরীবুল্লাহ্

Volume	2
Issue	1
Year	1958
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Anisuzzaman
Published online	August 16, 2025
DOI	10.62328/sp.v2i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v2i1.3
Pages	41-92
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

'সায়ের' ফকির গরীবুল্লাহ্

আনিসুজ্জামান

Check for updates

কোন দেশের সাহিত্যে এমন একটি তারিখ পাওয়া দুষ্কর, যেখানে আমরা নিশ্চিতভাবে একটি যুগের সমাপ্তি ও অপরটির সূচনা নির্দেশ করতে পারি। তবুও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে বসে এমন যুগবিভাগ না করে উপায় নেই।* বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তাই সাধারণভাবে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মধ্যযুগের অবসান ও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলে গণ্য করা হয়েছে। অবশ্য ১৭৬০এর পরও মধ্যযুগের আদর্শ বহন করে রামপ্রসাদ কাব্যসাধনা করেছিলেন এবং ১৮৬০এর অনেক আগেই বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পূর্বসূচনা করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। তবু এ সত্য অনস্বীকার্য যে, এঁদের কালে মধ্যযুগের কাব্যাদর্শ অক্ষুণ্ণ ছিল না এবং যথার্থ আধুনিকতার বিকাশ হয় নি। সুতরাং ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ —এই একশো বছরকে আমরা মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের অন্তর্বর্তী ক্রান্তিকাল হিসেবে গণ্য করতে পারি।

এই ক্রান্তিকালের আগে ও পরে বাংলার কাব্যক্ষেত্রে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁরা 'কবি' বলেই পরিচিত। কিন্তু এই একশো বছরে বাংলা কাব্যের আসরে যাঁরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন, তাঁদের পরিচয় 'কবিওয়ালা' আর 'সায়ের' বলে (একালের অন্যতম বিশিষ্ট রীতির কাব্যরচয়িতারা 'সায়ের' নামেই নিজেদেরকে আখ্যাত করেছিলেন)। মধ্যযুগ অপসৃত হবার আগেই এই দুই ধারার সূত্রপাত হয়েছিল এবং আধুনিক যুগের উন্মেষের পরও তার অস্তিত্ব অব্যাহত ছিল, তবু এই ক্রান্তিকালই হচ্ছে এঁদের কাব্যচর্চার যথার্থ সময়।

---

*'In the history of a nation and still more in its intellectual history—there comes no point where we can say with perfect satisfaction and confidence, Here ends a "period". Yet, for practical reasons, such dividing lines must be made.'—Browne : Literary History of Persia, Vol. II, p 542.

ফকির গরীবুল্লাহ্ বাংলার প্রথম 'সায়ের'। অর্থাৎ পূর্বসূরীদের তুলনায় স্বতন্ত্র একটি কাব্যধারার প্রবর্তন করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন, যে ধারায় পেয়েছিলেন তিনি বহু উত্তরসাধক। এই কাব্যাদর্শের স্বরূপ নির্ণয় করতে হয় প্রধানত ভাষার দিক দিয়ে,—আরবী, ফারসী ও হিন্দী শব্দের বহুল মিশ্রণের ফলে এ ভাষা একটা আলাদা চেহারা নিয়েছে। আর ভাবের দিক দিয়ে এর বৈশিষ্ট্য, ফারসী উপাখ্যানের অনুবাদ-অনুসরণের মাধ্যমে প্রণয়কাহিনী এবং ইসলামকেন্দ্রিক জীবন ও সাহিত্যের প্রতি অতিশয় আগ্রহের প্রকাশ, আর যা কিছু উদ্ভট ও অতিপ্রাকৃতিক, তার প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধানিবেদন। এই লক্ষণ অবশ্য আগেকার কাব্যেই দেখা দিয়েছিল, তবে এযুগে যে তা প্রধান ও প্রকট হয়ে ওঠে একথা বোধহয় বলা চলতে পারে।

মধ্যযুগের কাব্যাদর্শের থেকে একটু পৃথক এই কাব্যধারার উদ্ভব কেমন করে সম্ভবপর হল, সে প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। পাঠান আমলের মুসলিম নৃপতিরা যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন আর সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁদের সামন্তরা যেভাবে বিদ্যোৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন, তার ফলে খুব সহজেই বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। মোগল আমলে কিন্তু সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় নি। হোসেন শাহী সুলতানদের মতো মোগল শাসকেরা কেউই মনে প্রাণে বাঙালী হয়ে ওঠেন নি—রাজকার্যে নিযুক্ত হয়ে এদেশে যাঁরা অস্থায়ীভাবে এসেছিলেন, বিদেশী সংস্কৃতির ছাপাটা তাঁদের মধ্যে বেশ লক্ষ্যনীয় ছিল। তাছাড়া, নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় হিসেবপত্র রাখার বিধি হল ফারসী ভাষায়, তাই সরকারী কর্মচারী ও উচ্চাভিলাষী বাঙালীরা ফারসী শিখতে ও তার চর্চা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[১] তার উপর, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উত্তর ভারতে

১। সমসাময়িক সাহিত্যে এই ব্যাপক ফারসী চর্চার সাক্ষ্য আছে। যেমন, কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গলে' আছে :

'অবিলম্বে উত্তরিল রাজার নগরে।
বালকে ফারসী পড়ে আখন হুজুরে॥
সোনার কলম কানে দোয়াতি সম্মুখে।
কিতাবত নিপুণ কায়স্থগণ লেখে॥'

দ্রষ্টব্য : ব্যোমকেশ মুস্তফী : রায়মঙ্গল। সা-প-প, ১৩০৩।

উর্দু ভাষার ব্যবহার হতে থাকে lingua franca হিসেবে এবং আলোচ্য সময়ে আমাদের দেশেও তার গভীর প্রভাব দেখা দেয়। এর মাধ্যমে বহু ফারসী ও হিন্দী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে এবং ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। যদিও চতুর্দশ শতাব্দী থেকে এদেশের শাসনকার্যে ফারসী ভাষার ব্যবহারের ফলে বাংলায় অনেক ফারসী শব্দ গৃহীত হয় এবং বাঙালীরা যথেষ্ট পরিমাণে ফারসীর চর্চা করেন, তবু ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব সর্বপ্রথম দেশময় ব্যাপ্ত হবার সুযোগ পায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে।[১] আর মোগল দরবারই ছিল এর উৎসমুখ।

এদিকে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইরানে সাফাভি বংশের পতনের পর বহু জ্ঞানী, গুণী ও ধর্মবেত্তা শিয়া দেশত্যাগ করে বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ তো প্রকৃতপক্ষে বাংলায় শিয়া বংশের পত্তন করেছিলেন, তাই দেশত্যাগী ইরানী শিয়ারা এখানে সাদরে গৃহীত হলেন আর দেশময় ছড়িয়ে গিয়ে ফারসী সংস্কৃতির প্রভাবকে তাঁরা আরো বিস্তৃত করে তুললেন।[২] আঠারো শতকের বাংলায় এই প্রভাবের গভীরতা অনুভব করা যায় ভারতচন্দ্রের জীবন-কাহিনী থেকে। ব্রাহ্মণবংশের সন্তান ভারতচন্দ্র যখন ফারসী না শিখে সংস্কৃত শিখতে চেয়েছিলেন, তখন আত্মীয়স্বজনের কাছে হতবুদ্ধি ও দলচ্যুত বিবেচিত হয়ে তিনি তিরস্কৃত হয়েছিলেন।[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার হিন্দুমানসে মুসলিম-আনীত ভাষা ও সংস্কৃতির যে সহজ স্বীকৃতির পরিচয় এখানে পেলাম, তা হিন্দু-মুসলমান ভাবধারার নৈকট্যের পরিচায়ক, এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। বাংলার মানুষ যাঁরা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং মুসলমান যাঁরা বিদেশী সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে এদেশে এসেছিলেন, বাংলার লৌকিক চারিত্রের প্রভাব তাঁরা এড়াতে পারেন নি। রক্তের

১। Chatterji : ODBL, Pt. I, p 204.

২। Sarkar : History of Bengal, Vol. II, pp 223-25.

৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস : ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, ভূমিকা, পৃ২৬।

সমন্বয় এই কাজ অনেকদূর এগিয়ে দেয়। সাধারণ মুসলমানদের কথা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, বাংলার নবাবেরা ও তাঁদের পরিবার-পরিজনই নানাভাবে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান পালন করছেন।[১] অন্যপক্ষে হিন্দুরাও মসজিদ ও পীরের দরগাহে শিন্নী দিতেন।

তবে হিন্দুদের পুরাণ-পাঁচালির প্রভাবে মুসলিম-মানসে একটা ভিন্ন প্রতিক্রিয়াও জেগেছিল। ফলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্যে অনেকেই ভেতরে ভেতরে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। ধর্মস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতনতা আর দেশীয় সংস্কার মিলে লৌকিক দেবদেবীর মুসলমান counterpart সৃষ্টি এবং হিন্দু দেবদেবীদের জায়গায় তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা দিয়েছিল।[২] মোগল আমলে উত্তর ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে এবং ইরানী বাস্তুত্যাগীদের আবির্ভাবের ফলে বাংলায় বহু ধর্মবেত্তা ও পীর ফকির দেখা দেন। তাঁদের শিক্ষা ও প্রেরণা এবং পূর্ববর্তী পীর মুর্শিদদের স্মৃতি ধর্ম নিয়ে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হতে বাংলার মুসলমানদেরকে প্ররোচনা দিল। তাই উগ্রতা—যাকে militancy বলা যায়, কিংবা অলৌকিকতা—অর্থাৎ miracle, অথবা বাস্তব লাভালাভ—মানে material benefit দেখিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রচেষ্টা ইতোপূর্বেই শুরু হয়েছিল, তা এবারে ব্যাপক আকার ধারণ করল। ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ-অনুসরণ, ইতিহাসের পটে কাল্পনিক কাফের-দলন কাহিনী, পীরের কাছে দেবদেবীর পরাজয়বরণ ও পীরের প্রতিষ্ঠালাভের উপাখ্যান বাংলায় রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। তবু তাঁরা হয়তো জানতেন যে, জেহাদী মনোভাবটাই মানবচিত্তের একমাত্র বৃত্তি নয়; তাই সুকুমার অনুভূতির চাহিদা মেটাতে ধর্মের মোড়ক দেওয়া প্রণয়কাহিনীও রচিত হল। আর এসবের অধিকাংশের মূলই হচ্ছে ফারসী রচনা: অবশ্য তার অনেকগুলোই আবার বাংলায় এসেছিল উর্দু'র মাধ্যমে।

১। Datta : Alivardi and his Times, pp 256-59 দ্রষ্টব্য।

২। সুকুমার সেন: ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ ৮২ দ্রষ্টব্য।

সারা বাংলা দেশ জুড়ে যে ফারসী সংস্কৃতির প্রভাব দেখা দিয়েছিল, নগরে ও বন্দরেই তার প্রকাশ হয়েছিল তীব্রতম। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র ঢাকা, রাজধানী মুর্শিদাবাদ ও হুগলী বন্দর তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটা স্বাভাবিকও। বিদেশী লোকদের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগের ফলে এসব জায়গার ভাষায়ও বিদেশী শব্দ অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হতে শুরু করেছিল। হুগলী বন্দর দিয়ে আরব, ইরান, ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলত ঃ সেই উপলক্ষ্যে বহু বিদেশী ধনিক ও বণিক সেখানে বাস করতেন। ঐতিহাসিকদের মতে, মুর্শিদাবাদের পরিপূর্ণ বিকাশের আগে থেকেই হুগলী একটা 'শিয়া উপনিবেশ' ও ফারসী সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।[১] তাই আশ্চর্য নয় যে, আমাদের আলোচ্য কাব্যধারার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল এরই সন্নিহিত অঞ্চল থেকে।

নবাবী আমলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায়, এভাবে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল অলক্ষ্যে, বাংলার কাব্যের ক্ষেত্রে তা যখন পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেল, তখন দেখা গেল, সে নবাবও নেই, সে বাংলাও নেই। আর তাই সেই বাংলা কাব্যেরও রূপান্তর না হয়ে পারল না।

দুই

কিন্তু পরিপূর্ণভাবে এই পরিবর্তনের প্রকাশ হবার আগেই তার পূর্বসূচনা হয়েছিল, এবং আশ্চর্যের বিষয়, হিন্দু কবির হাতে। গরীবুল্লাহ্‌র সঠিক সময়নির্ণয় আজো সম্ভবপর হয়নি, তবে নানাকারণে তাঁকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালের কবি বলে মনে হয়। সেই হিসেবে কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁর পূর্ববর্তী। তাঁর 'রায় মঙ্গল' লেখা হয়েছিল ১৬৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে, কবির ২০ বছর বয়সে। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ গাজীর মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হবার পর কোরান-পুরাণ হাতে অর্ধ শ্রীকৃষ্ণ-পয়গম্বরমূর্তি ঈশ্বর এসে মুণ্ডচ্যুত দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বড় খাঁ গাজীর বন্ধুত্ব জন্মিয়ে দিলেন এবং তাঁদের মধ্যে রাজত্ব ভাগ করে দিলেন,—এইই কাহিনীর সার। কৃষ্ণরামের ভাষা সাধারণত মধ্যযুগের বাংলার চেয়ে স্বতন্ত্র নয়, তবে পাত্রবিশেষের মুখে তিনি ব্যবহার করেছেন হিন্দী ফারসী

১। Sarkar : op. cit, p 225.

মিশ্রিত বাংলা। যেমন, বড় খাঁ গাজীর উক্তি ঃ

'ভাগ গিয়া [শালা] এবে কিয়া করে আব।
হোগা হারামজাদ খানে খারাব ॥
শোস্তে হো-দক্ষিণরায় এসা দাগাবাজী।
বাঁধকে লে আনেসে তবে হাম গাজী ॥'

'কবি কৃষ্ণরাম কেবল পীর গাজীর মুখেই ভাঙ্গাভাঙ্গা উর্দ্দু কবিতা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নহে ঃ তুরঙ্গ সহরের ঘাটোয়াল ও কোটালের মুখেও ঐ ভাষা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।'[১]

কবি বিদ্যাপতি তাঁর 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী'তে পীরের মুখে ফারসীবহুল বাংলা ব্যবহার করেছেন।[২]

'অন্নদামঙ্গলে' রাজা বীরসিংহ ও ভাটের কথোপকথনে হিন্দী এবং সম্রাট জাহাঁগীর ও মানসিংহের কথাবার্তায় এই মিশ্র ভাষা ভারতচন্দ্র প্রয়োগ করেছেন। যেমন ঃ

'মানসিংহ যোড়হাতে অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে
কহে জাহাঁপনা সেলামত।
রামজীর কুদরতে মহিম হইল ফতে
কেবল তোমারি কিরামত ॥
হুকুম শাহানশাহী আর কিছু নাহি চাহি
জের হৈল নিমকহারাম।
গোলাম গোলামী কৈল গালিম কয়েদ হৈল
বাহাদুরী সাহেবের নাম ॥'[৩]

১। ব্যোমকেশ মুস্তফী ঃ পূর্বোক্ত।

২। সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৮১০।

৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩৯। এইসঙ্গে দ্রষ্টব্য পৃ ৩১০-১১, ৩৩৯-৪১, ৪৪৪।

তাঁর 'সত্যনারায়ণের ব্রতকথায়' ফকিরবেশী বিষ্ণু অর্থাৎ সত্যপীরের মুখে মিশ্র ভাষাই শোনা যায়।

রামপ্রসাদ ছিলেন গরীবুল্লাহ্‌র সমসাময়িক। তাঁর 'বিদ্যাসুন্দরে' মিশ্র ভাষার ব্যবহার অধিকতর। সুন্দরের প্রতি মাধব ভাটের উক্তি, বিদ্যার গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাজার ক্রোধ, কোটালের চোর অন্বেষণে যাত্রা, বর্ধমানে সুন্দরের আগমন প্রভৃতি অংশে এই মিশ্র ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মাধব ভাটের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

'বাবুজি কুর্নিশ মেরা বর্ধমান বিচ ডেরা
নাম তো হামারা মাধো ভাট।
আরোজ করো গে পিছে ঘড়ি এক বৈঠে নীচে
আর তো লাগায় তোম হাট ॥···
বীরসিংহ নাম রাজা জাতমে হায় বড়া তাজা।
শোনে হোঁগে ওন্‌কা জেকের।
ওন্‌কা ঘরমে লেড়কি এক তারিফ করে মে কেত্তেক
রাত দিন সাদিকা ফেকের ॥'[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখা কয়েকটি সত্যপীর পাঁচালীতেও পীরের কথাবার্তায় মিশ্র বাংলা ভাষার ব্যবহার দেখা যায়।

তবে এইসব কাব্যে হিন্দী ফারসী মিশ্রিত বাংলার সীমাবদ্ধ প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বাস্তবতাবোধের তাগিদে এবং কোথাও সৌন্দর্য সৃষ্টির অনুরোধে এই কবিরা মিশ্র ভাষার ব্যবহার করেছেন, এটাকে সম্পূর্ণ রচনায় রীতি হিসেবে গ্রহণ করেন নি। মিশ্র ভাষার গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত না হয়েও তাই আমরা বলতে পারি যে, গরীবুল্লাহ্‌ই সর্বপ্রথম এই ভাষায় সম্পূর্ণ কাব্য রচনা করে একটি অভিনব পথ প্রদর্শন করেন।

১। রামপ্রসাদ সেন: গ্রন্থাবলী, পৃ ৩

তিন

স্বলিখিত কাব্যসমূহ এবং সৈয়দ হামজা-প্রদত্ত পরিচিতি থেকে গরীবুল্লাহ্‌র সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হুগলী জেলার (তখনকার বর্ধমান জেলার) বালিয়া পরগণার অন্তর্গত হাফিজপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাহা হুন্দি। কবি ছিলেন পিতার প্রথম সন্তান। সাহা হুন্দি ছিলেন 'আল্লার ফকির' এবং এই সূত্রে কবি নিজেকে 'ফকির' আখ্যা দিয়েছেন। অতএব তাঁরা পীরের খানদান। কবি ছিলেন বড় খাঁ গাজীর ভক্ত এবং গাজী অনুগ্রহ করে তাঁকে গোপনে (স্বপ্নে?) সাক্ষাৎ দান করেন। এই বড় খাঁ গাজীই কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিয়েছেন। বড় খাঁ গাজী নামে একটি ঐতিহাসিক চরিত্রের সন্ধান অবশ্য পাওয়া যায় — তিনি সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও পীর জাফর খাঁ গাজীর তৃতীয় পুত্র। পাণ্ডুয়ায় জাফর খাঁ গাজীর সমাধির পাশে বড় খাঁ এবং তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্রের সমাধি ব্লকম্যান দেখেছিলেন।[১] দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহের (অথবা বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের[২]) আত্মীয় শাহ সফিউদ্দীন পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যে বাহিনী নিয়ে আসেন, জাফর খাঁ তার দলভুক্ত ছিলেন[৩] এবং পরে হুগলীর রাজা ভূদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেয়ে নিহত হন (ত্রয়োদশ শতাব্দী)।[৪] কথিত আছে যে, বড় খাঁ হুগলীর (?) রাজাকে পরাজিত করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন।[৫] তবে জাফর খাঁর পুত্র বড় খাঁর সঙ্গে লৌকিক পীর বড় খাঁ গাজীর সম্বন্ধ নির্ণয়

১। H. Blochmann : Notes on some Arabic and Persian Inscriptions in the Hugli District. JASB, 1870.

২। Ibid.

৩। H. Blochmann : Notes on places of Historical interest in the District of Hugli. Proc. ASB, 1870.

৪। D. Money : An Account of the Temple of Triveni near Hugli. JASB, 1847.

৫। O' Mal'ey & Chakravarty : Bengal District Gazetteers : Hooghly, p 256

করা দুষ্কর। ('জঙ্গনামা'য় অবশ্য এয়াকুবের ভণিতায় জাফর (দপর) খাঁর প্রশস্তি আছে)। ডক্টর সুকুমার সেন ইঙ্গিত করেছেন যে সুফী খাঁ বা ইসমাইল গাজীই পরবর্তীকালে বড় খাঁ গাজীতে পরিণত হয়েছেন।[১] সুফী খাঁ অর্থাৎ শাহ সফিউদ্দীনের কথা একটু আগেই বলেছিঃ ব্লকম্যান তাঁর শেষোক্ত প্রবন্ধে অবশ্য মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় মুসলিম সাধকদের জীবনীগ্রন্থসমূহে কোথাও এঁর উল্লেখ নেই। ইসমাইল গাজী সম্পর্কে কিংবদন্তী এই যে, তিনি রসুলুল্লাহ্‌র বংশধর। আরব থেকে কতিপয় সঙ্গীসাথী নিয়ে তিনি লক্ষ্মণাবতীতে সুলতান বারবক শাহের দরবারে আসেন। মান্দারণের বিদ্রোহী রাজাকে দমন করার পর তিনি কামরূপরাজকে পরাজিত ও ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত শত্রুদের চক্রান্তে সুলতানের আদেশে তাঁর শিরশ্ছেদ হয় (১৪৭৪ খৃঃ) এবং তাঁর মস্তক কাঁটাদুয়ারে (রংপুর) ও দেহ মাদারণে (হুগলী) সমাধিস্থ হয়।[২] কিন্তু এঁদের সঙ্গেও লৌকিক বিশ্বাসের বড় খাঁ গাজীর সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা চলে না। শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র 'সত্যপীরের পুস্তকে'[৩] এবং বিদ্যাপতির 'সত্যনারায়ণ পাঁচালীতে'[৪] বড় খাঁ গাজী, শাহ সুফী ও ইসমাইল গাজীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের উল্লেখ আছে। তাই মনে হয় যে, দক্ষিণ রায়ের মতো তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বড় খাঁ গাজীও সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্রঃ তবে বড় খাঁ গাজীর নাম ও ইসমাইল গাজীর স্মৃতি তাঁকে লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করে।

গরীবুল্লাহ্‌র জীবন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের অভাবে তাঁর সময়নির্ণয় করাও অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছে। এমন কি, কি কি বই তিনি লিখেছেন, এ নিয়েও মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। 'আমীর হামজা'র প্রথম পর্ব যে তাঁর লেখা এতে কেউ সন্দেহ করেন না। এখানে তিনি পীর বড় খাঁ গাজী ও পিতা সাহা দুন্দির উল্লেখ করেছেন এবং 'ফকির গরীব' 'গরীব' ও 'গরীব ফকির' ভণিতা ব্যবহার

১। সুকুমার সেনঃ ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ ১০৬।

২। G. H. Damant: Notes on Shah Ismail Ghazi: JASB, 1874.

৩। সুকুমার সেনঃ পূর্বোক্ত, পৃ ৮০ দ্রষ্টব্য।

৪। সুকুমার সেনঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৮০৭।

করেছেন। সকলেই স্বীকার করেন যে, ফকির মোহাম্মদ[১] ও (ঢাকার) মুনশী গরীবুল্লাহর[২] নামে প্রচলিত 'ইউছফ জেলেখা' ফকির গরীবুল্লাহ্‌রই রচনা। কেননা, এতে বড় খাঁ গাজীর স্পষ্ট উল্লেখ আছে ঃ

'অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত।
বড় খাঁ বাতুনে যারে দিল মোলাকাত ॥'

আর ভণিতায়ও পাওয়া যায় 'ফকির গরীব' 'গরীব ফকির' ও 'অধীন ফকির'। 'অধিন ফকির' ভণিতা সম্ভবত 'গরীব ফকিরের'ই বিকৃতি।

মোহাম্মদ এয়াকুবের নামে প্রচলিত 'জঙ্গনামা (বা মোক্তাল হোসেন)' র[৩] বন্দনা অংশে এবং শেষার্ধে এয়াকুবের ভণিতা থাকলেও, গরীবুল্লাহ্‌র মৌলিক ভণিতাও এতে আছে। 'অধীন ফকির' ও 'অধম ফকির' কেবল নয়, আরো স্পষ্টোক্তি আছে ঃ

১। ফকিরউদ্দীন বা ফকির মোহাম্মদের রচনা : 'এমামচুরির পুথি'। তাঁর নামে প্রচলিত : 'ইউছফ জেলেখা' ও 'সোনাভান'।

২। মুনশী গরীবুল্লাহ্‌র রচনা : 'দেলারাম' 'নেকবিবির কিচ্ছা' ও 'ইবলিছ নামার পুঁথি'। তাঁর নামে প্রচলিত : 'ইউছফ জেলেখা'।

৩। অধ্যাপক আহমদ শরীফ মনে করেন যে, এই কাব্যের নাম 'হোসেনমঙ্গল'। সমস্ত কাব্যে একবার কেবল উক্ত হয়েছে 'অধিন এয়াকুব কহে হোসেনের মঙ্গল'। কিন্তু এই একটিমাত্র পংক্তির উপর নির্ভর করে এই নামকরণ করা যায় কি না সন্দেহ। কেননা, এই কাব্য যে মোক্তাল হোসেনের অনুবাদ ও এটি যে জঙ্গনামা, সে উক্তি আমরা বহুবার পেয়েছি। যেমন :

(১) ফার্শী কেতাব ছিল মোক্তাল হোসেন।
তাহা দেখি কবি আমি করিনু রচন ॥

(২) জঙ্গনামা কেতাবের কথার প্রমাণ।
পাচালিতে অধম এয়াকুব গীত গান ॥

(৩) জঙ্গনামার কথা হয় সহদ সাগর।
অধিন এয়াকুব কহে শুন সাধুবর ॥

'অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত।
বড় খান গাজী যারে দিল মোলাকাত॥'
'বাপ নাম সাহা তুন্দি আল্লার ফকির।
ভাটিয়া সোলতান গাজী বড় খান পীর॥'

এ সত্ত্বেও আবদুল গফুর সিদ্দিকী 'জঙ্গনামা'কে এয়াকুবের রচনা (১১০১ বঙ্গাব্দ) বলে মনে করেন।[১] কিন্তু ডক্টর সুকুমার সেনের মতে এটি গরীবুল্লাহ্‌র রচনা, এয়াকুব পুথির লেখক মাত্র।[২] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ও কাব্যটিকে গরীবুল্লাহ্‌র রচনা বলে মনে করেন, তাঁর মতে, এয়াকুবের ভণিতা প্রকাশকদের কারসাজি ছাড়া আর কিছু নয়।[৩] এ বিষয়ে ডক্টর এনামুল হক একটি মধ্যপথ অবলম্বন করেন: তাঁর মতে, গরীবুল্লাহ্ 'জঙ্গনামা'র প্রথমাংশ লেখেন, এয়াকুব লেখেন শেষাংশ।[৪] এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবশ্য বলবার আছে। প্রথমত, একই কবির (গরীবুল্লাহ্) একাধিক রচনা অসমাপ্ত থাকা একটু আশ্চর্যের বিষয়। দ্বিতীয়ত, অন্য কবির অসমাপ্ত কাব্য সম্পূর্ণ করতে যেয়ে অনুবর্তী কবিরা যে স্পষ্টভাষণ করে থাকেন (যেমন দৌলত কাজীর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী' সম্পূর্ণ করতে গিয়ে আলাওল এবং গরীবুল্লাহ্‌রই 'আমীর হামজা' সমাপ্ত করতে গিয়ে সৈয়দ হামজা বলেছেন), এখানে তেমন পরিষ্কার মন্তব্য নেই। তৃতীয়ত, গরীবুল্লাহ্ যখন প্রথমাংশই লিখলেন, তখন বন্দনা-অংশে এয়াকুবের ভণিতা পাওয়া যাচ্ছে কেন? এই দিক দিয়ে দেখলে এয়াকুবকে লিপিকর বলাই সমীচীন মনে হয়।

অধুনা সৈয়দ হামজার[৫] নামে প্রচলিত 'সোনাভান' কাব্যে ভণিতা আছে

১। আবদুল গফুর সিদ্দিকী: মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য। সা-প-প, ১৩২৩।

২। সুকুমার সেন: পূর্বোক্ত, পৃ ৯১৬।

৩। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্: পুঁথিসাহিত্যের আদিকবি গরীবুল্লাহ্ শাহ্। মোহাম্মদী: কার্তিক, ১৩৬১।

৪। মুহম্মদ এনামুল হক: মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃ ২৯৪।

৫। সৈয়দ হামজার রচনা: 'কেচ্ছা মধুমালতী', 'আমীর হামজা' (দ্বিতীয় পর্ব), 'জৈগুনের পুথি' ও 'হাতেম তাই'। তাঁর নামে প্রচলিত: 'সোনাভান' ও 'লালগোন'।

'অধীন গরীব' ও 'অধীন ফকির' বলে। এ ভণিতা যে হামজার নয়, গরীবুল্লাহ্‌র —তা আমরা দেখেছি। তাই বড় খাঁ ও সাহা ছন্দির উল্লেখ না থাকলেও এটাকে আমরা গরীবুল্লাহর রচনা বলেই মনে করব। সৈয়দ হামজার নামে প্রচলিত হবার আগে থেকেই 'সোনাভান' অবশ্য ফকিরউদ্দীন বা ফকির মোহাম্মদের নামে প্রচলিত আছে (সেখানে সমর্ত্তভান হয়েছেন সমৃতভানু)।[১] তাই আবদুল গফুর সিদ্দিকী মনে করেন যে, ১১৫৫ বঙ্গাব্দে ফকির মোহাম্মদ 'সোনাভান' রচনা করেন।[২] ডক্টর এনামুল হক এটাকে সৈয়দ হামজার রচনা বলে মনে করেছেন।[৩] কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে, 'সোনাভানের' রচয়িতা গরীবুল্লাহ্‌ই।[৪] ভণিতা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাই। বৃটিশ মিউজিয়মের সংগ্রহে আবদুল ওয়াসীর নামে একটি 'সোনাভান' কাব্য আছে ঃ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় সেটা মুদ্রিত হয়।[৫] ইনি কোন স্বতন্ত্র 'সোনাভানের' রচয়িতা কিংবা গরীবুল্লাহ্‌র বইটির প্রকাশক, তা বলা যায় না।

ওয়াজেদ আলীর লেখা বলে প্রচলিত 'সত্যপীরের পুথি (মদন-কামদেবের পালা)' তে ভণিতা সর্বত্র আছে 'অধীন গরীব' 'অধীন ফকির' ও 'হীন ফকির' বলে, কাব্যের শেষে একবার মাত্র আছে 'হীন ওয়াজেদ আলী কহে সবাকে সালাম'। আবদুল গফুর সিদ্দিকী লিখেছেন যে, ১২৮৬ সালে ওয়াজেদ আলী এই কাব্য রচনা করেন,[৬] কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই। ওয়াজেদ আলী যে লিপিকর, এতে কোন সন্দেহ নেই। কাব্যটি গরীবুল্লাহ্‌র রচনা বলে ডক্টর

১। ঢাকার হামিদিয়া লাইব্রেরীর একটি সংস্করণে (২০.১১.৪১ ইং) রচনাকাল আছে ১১২৭ সাল, মাঘ মাস। এ তারিখ যথার্থ নয়।

২। আবদুল গফুর সিদ্দিকী : পূর্বোক্ত।

৩। মুহম্মদ এনামুল হক : পূর্বোক্ত, পৃ ২৯৪।

৪। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ : পূর্বোক্ত।

৫। Blumhardt : Catalogue of Bengali Books in the library of British Museum.

৬। আবদুল গফুর সিদ্দিকী : পূর্বোক্ত।

শহীদুল্লাহ্ যে সিদ্ধান্ত করেছেন,[১] ভণিতা থেকে সেটাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'ও উল্লিখিত পাঁচটী কাব্যগ্রন্থকেই গরীবুল্লাহ্‌র রচনা বলে গ্রহণ করা হয়েছে।[২]

গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যসমূহের প্রচলিত সংস্করণগুলোয় সাধারণত রচনাকাল পাওয়া যায় না। 'জঙ্গনামা'র একটি পাণ্ডুলিপির উপরে নির্ভর করে ডক্টর এনামুল হক বলেছেন যে, ১১০১ সালে চব্বিশ পরগণার কবি মোহাম্মদ এয়াকুব গরীবুল্লাহ্‌র কাব্য সমাপ্ত করেন। তিনি আরো বলেন যে, গরীবুল্লাহ্ ও এয়াকুবের মধ্যে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল—এ সাক্ষাৎকারের কোন প্রমাণ অবশ্য তিনি দেন নি।[৩] কয়েকটি কারণে এই তারিখের যাথার্থ্য সন্দেহ না করে পারা যায় না। ১২০১ সালে গরীবুল্লাহ্‌র 'আমীর হামজা'র দ্বিতীয় পর্ব রচনা করেন সৈয়দ হামজা। এই প্রসঙ্গে তিনি গরীবুল্লাহ্‌র অসমাপ্ত রচনার জন্যে লোকসাধারণের অনুভূতির কথা বিবৃত করেন ঃ

'যতদূর আছে তাঁর কবিতার হার।
দেখিয়া শুনিয়া লোকে হয় জারেজার॥
কেচ্ছার পহেলা আধা শুনিয়া আলম।
আখেরী কেচ্ছার তরে করে বড়া গম॥...
না পারিনু এড়াইতে লোকের খাহেশ।
গাঁথিনু কবিতা আমি ভাবিয়া বিশেষ॥
বিদ্যাবুদ্ধিহীন আমি যাহা কিছু মানি।
গাঁথিনু কবিতা আমি আখেরী কাহিনী॥'

'জঙ্গনামা'র উক্ত তারিখ অভ্রান্ত বলে স্বীকার করলে বলতে হয় যে, একশো বছর পরও একটা অসমাপ্ত কাব্যের জন্যে লোকসমাজে এই আকলিবিকুলি ছিল,

---

১। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : পূর্বোক্ত।

২। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃ ২৪।

৩। মুহম্মদ এনামুল হক : পূর্বোক্ত, পৃ ২২৪।

যা সৈয়দ হামজাকে ঐ কাব্য সম্পূর্ণ করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। বাস্তবতার দিক দিয়ে এই ঘটনার দাবী বোধহয় খুবই দুর্বল। দ্বিতীয়ত, যতদূর জানি, গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যের এমন কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি —যার লিপিকাল থেকে তাঁকে মধ্য-অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলে মনে করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যেকথা বলেছেন, ভাষার দিক দিয়েও 'জঙ্গনামা' কাব্যকে আঠারো শতকের আগের রচনা বলে মনে করা যায় না।[১]

'ইউসুফ জেলেখা'র উপসংহারে কবির নিম্নলিখিত উক্তি থেকে ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ মনে করেন যে, কাব্যটি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত হয়ঃ

'আল্লাতালা ছালামতে রাখিবে বাদশারে !
ছহি ছালামতে রাখ বাদশার উজিরে ॥
বজায় ছালামত রাখ রাজার দেওানে।
সিকদার চোপদার ইজারাদার জনে ॥'

তিনি মনে করেন যে, এখানে দিল্লীর সম্রাট (বাদশা), নওয়াব নাযিম (বাদশার উজির) ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর (রাজার দেওয়ান) ইঙ্গিত আছে।[২] আমার ব্যবহৃত সংস্করণে এই অংশে পাঠভেদ দেখা যায়। পাঠভেদের কথা বাদ দিলেও, এই পংক্তিগুলো থেকে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি না, তা সন্দেহের বিষয়। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, 'বাদশা' আর 'রাজা' শব্দ দুটি এখানে একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। আগের দুই পংক্তিতেই যখন কবি 'বাদশা' শব্দের ব্যবহার করেছেন, তখন তৃতীয় পংক্তিতে এসে সেখানে 'রাজা' শব্দ ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই মনে হয় যে, এখানে রাজা বলতে ভূস্বামী অর্থাৎ বর্ধমানের রাজাদের প্রতিই কবি ইঙ্গিত করেছেন। তাহলে এর রচনাকাল ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী হওয়াই সম্ভব ঃ কারণ, ঐ বছরই বর্ধমান রাজবংশের তিলকচন্দ্র রায় মোগল সম্রাট আহম্মদ শাহের কাছ থেকে প্রথম 'রাজা' খেতাব পান।[৩]

১। Chatterji : Op. cit, p 212.

২। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ : পূর্বোক্ত।

৩। Peterson : Bengal District Gazetteers : Burdwan, p 31.

'আমীর হামজা'র প্রথম পর্বের দুটি পংক্তি গরীবুল্লাহ্‌র সময় নির্ধারণে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেঃ

'গরীব কহেন সাহা নেজামের পায়।
কেতাব মাফিক এত্তা দূর হইল দায়।।'

এই সাহা নেজাম কে ছিলেন? কেউ কেউ মনে করেন যে, ইনি স্বনামধন্য দরবেশ নিজামউদ্দীন আউলিয়া।[১] কিন্তু তাহলে অথবা ইনি যদি কবির অন্য কোন পীর হতেন তাহলেও কবির অন্যান্য কাব্যেও এঁর উল্লেখ পাওয়া যেত। এইজন্যেই মনে হয় যে, সাহা নেজাম কবির কোন পীর-মুর্শিদ নন, বরঞ্চ দেশের শাসক হতে পারেন। এরপরে সঙ্গতভাবেই আমাদের মনে পড়ে মীর জাফরের পুত্র নিজামউদ্দৌলা বা নাজিমউদ্দৌলার কথা—পিতার মৃত্যুর পর অল্পকালের জন্যে (১৭৬৫-৬৬) যিনি বাংলায় নবাবী লাভ করেছিলেন। এই সময়ে প্রথম পর্ব 'আমীর হামজা' রচিত হয় এবং তার ত্রিশ বৎসর পর (১৭৯৪) সৈয়দ হামজা এর দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত করেন—যদিও তার দু বছর আগেই তিনি রচনা শুরু করেছিলেন।

'ইউসুফ-জেলেখা' ও 'আমীর হামজা'র অনুমিত রচনাকাল মোটামুটি পরস্পরসমর্থিত। অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফকির গরীবুল্লাহ্ কাব্য সাধনা করেছেন আর তার ফল হচ্ছে (১) ইউসুফ জেলেখা,[২] (২) আমীর হামজা (প্রথম পর্ব),[৩] (৩) জঙ্গনামা,[৪] (৪) সোনাভান ও (৫) সত্যপীরের পুথি। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ছদ্ম-ঐতিহাসিক যুদ্ধকাহিনী এবং লৌকিক দেব বা পীরমাহাত্ম্যজ্ঞাপক পাঁচালী— তথাকথিত পুথি সাহিত্যের তিনটি প্রধান ধারাই তিনি পুষ্ট করেছিলেন।

১। Abdul Wali : A Bengali Book written in Persian Script. JASB, 1925

২। "প্রথম (?) মুদ্রণ : ১৮৬৭।"—সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৯২০, পাদটীকা।

৩। "প্রথম মুদ্রণ : ভুবনমহিমা যন্ত্র, ১২৬৩।" — ঐ, পৃ ৯১০, পাদটীকা।

৪। "প্রথম (?) মুদ্রণ : ১৮৬৭।" — ঐ, পৃ ৯১৫, পাদটীকা।

চার

'তথাকথিত' বলছি এইজন্যে যে, অনেকদিন ধরে এই বিদেশী শব্দবহুল বাংলা ভাষায় লেখা কাব্যগুলোকে বোঝাতে 'পুথিসাহিত্য' শব্দটা ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যদিও পুথিসাহিত্য বলতে তা বোঝা উচিত নয়। আধুনিককালে 'বই' বলতে আমরা যা বোঝাই, আগে 'পুথি' (বা 'পুঁথি') বলতে তাই বোঝাতো। তাই 'বই-সাহিত্য' কথাটার মতো 'পুথিসাহিত্য' কথাটাও অর্থহীন। 'পুথি' শব্দটাকে সংকীর্ণ অর্থে manucsript বলেও এখন গণ্য করা হয়ঃ এ ব্যবহার সন্তোষজনক কিনা, সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে, 'পুথি' শব্দের এই সীমাবদ্ধ ব্যবহারও আমাদেরকে 'পুথিসাহিত্য' কথাটির অর্থগ্রহণে কোন সাহায্য করে না। কেননা, এই কাব্যগুলো ছাপা হবার পরই সারা দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

আসলে এই বিশেষ রীতির কাব্যগুলোকে গত একশো বছরে নানাভাবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে, কিন্তু তার কোনটাই সন্তোষজনক নয়। লঙের পুস্তকতালিকায় এই মিশ্র ভাষাকে 'মুসলমানী ভাষা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১] ব্লুমহার্টও এই পথ অবলম্বন করেন।[২] তারপর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর সুকুমার সেনের মতো পণ্ডিতজনেরাও এই নামই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গ্রহণ করেন। কিন্তু এই ভাষা বাঙালী মুসলমানের কথ্যভাষা হিসেবে কতদূর ব্যাপকতা লাভ করেছিল, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রয়েছে। লঙ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, নগরের অধিবাসী আর মাঝিমাল্লাদের মাঝেই এ ভাষার প্রসার ছিল সীমাবদ্ধ। গ্রাম-বাংলার মুসলমানদের ভাষার সঙ্গে তাই এর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। উপরন্তু এ ভাষায় লেখা কাব্যগুলোকেও বিষয়বস্তু বা ভাবধারার দিক দিয়ে নির্বিচারে 'ইসলামী' বলা চলে না।

কলকাতার শস্তা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হয়ে এগুলো দেশময় প্রচারিত হয়েছিল বলে 'বটতলার পুথি' নামেও একে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলেছে। সেটাকে

১। Long : A Descriptive Catalogue of Bengali Works.

২। Blumhardt : Op. cit.

সুভাষিত করতে গিয়েই বোধহয় 'পুথিসাহিত্য' কথাটার উদ্ভব হয়। ইদানীং 'দোভাষী পুথি' বলে একে আখ্যাত করা হচ্ছে।[১] কিন্তু এই ভাষায় তো দুটি ভাষার নয়, বহু ভাষার শব্দ মিলেছে। সুতরাং একে বিদেশী শব্দবহুল বাংলা বা মিশ্র বাংলা বললেই বোধহয় সঙ্গত হয়। তার অনুসরণে এই কাব্যধারাকেও মিশ্র ভাষারীতির কাব্য বলে পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

এই ভাষার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে এইঃ আরবী, ফারসী ও হিন্দী শব্দের প্রয়োগবাহুল্য ; আরবী-ফারসী শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার ; হিন্দী ধাতুর ব্যবহার ; বিভিন্ন বাংলা ও আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের অনুসর্গ ও উপসর্গরূপে প্রয়োগ ; ফারসী বহুবচনের ব্যবহার।[২] পুংলিঙ্গে বাংলা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দপ্রয়োগ এবং সুপ্রচলিত বাংলা শব্দের বদলে অপ্রচলিত আরবী, ফারসী বা হিন্দী শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তাই যেখানে বাঙালী মুসলিম পরিবারের কথোপকথনে শতকরা পনেরো ভাগের বেশী আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার হয় না, গরীবুল্লাহ্‌র 'আমীর হামজা'য় সেখানে শতকরা প্রায় বত্রিশ ভাগ আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।[৩]

মিশ্র ভাষারীতির কাব্যগুলোকে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কয়েকভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমে আমরা পাই রোমাণ্টিক প্রণয়োপাখ্যান। দ্বিতীয় ধারার উপাখ্যানগুলোকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, এর দুটি ভাগ—ছদ্ম-ঐতিহাসিক আর লৌকিকঃ একদিকে ইতিহাসের পটে মুসলিম বীরদের কাল্পনিক কাফের-দলন কাহিনী, অন্যদিকে আমাদের দেশের পটভূমিকায় হিন্দু লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করে কিম্বা অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে মুসলমান পীর-ফকিরদের প্রতিষ্ঠার কথা। তৃতীয়ত পাই ইসলাম ধর্ম এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে ছন্দোবদ্ধ রচনা। গরীবুল্লাহ্‌র রচনা শেষ ধারাটি ব্যতিরেকে সেদিক দিয়ে 'সর্বত্রগামী'।

১। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : পূর্বোক্ত, ২১-৩২ ; আহমদ শরীফ : দোভাষী পুথির ভাষা। দিলরুবা, ১৩৬২।

২। সুকুমার সেন : ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ ১৮৬-৮৭।

৩। Chatterji : Op. cit, p 211.

পাঁচ

ইউসুফ-জুলায়খার প্রণয়োপাখ্যানের মূল উপাদান বাইবেল ও কোরআন শরীফ থেকে সংগৃহীত। বাইবেলে বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে কোরআনে বিবৃত ঘটনার পার্থক্য থাকলেও বিরোধ নেই। এই পার্থক্যের মধ্যে কেউ কেউ ইহুদী পুরাণের প্রভাব দেখতে পেয়েছেন,[১] এখানে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ধর্মগ্রন্থে নায়িকার কোন নাম নেই। বাইবেলে যাঁকে Potihar বলা হয়েছে, কোরআনে তাঁরও নামোল্লেখ নেই; কাব্যে অবশ্য তাঁর পরিচয় 'আজীজ মেছের' অর্থাৎ 'মিশরের প্রিয়' বলে,—এতে তাঁর নাম নয়, প্রধান মন্ত্রিত্ব পদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর কোরআনের অজ্ঞাতনামা সুন্দরী, বাইবেলের Potihar's wife কাব্যে হয়েছেন জলিখা বা জুলায়খা: এই নামটি ইহুদী উপাখ্যানে (Sefer hayashar) এবং ফিরদৌসী ও জামী প্রভৃতি ইরানী কবির রচনায় কোরআন-পরবর্তীকালের সংযোজনা।[২] কোরআন-কাহিনীর কাঠামোয় ধীরে ধীরে রক্তমাংস জুড়ে এই উপাখ্যান পরিণত ও পৃথক হয়ে ওঠে। সব চরিত্রগুলিরই নামকরণ হয়, নানা অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা যুক্ত হয় এবং মূল প্রণয়কাহিনী মিলনান্ত পরিণতি লাভ করে। বলা বাহুল্য যে, ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীর পরিবর্তনে কিংবা ইউসুফ নবীকে নিয়ে কল্পনাশ্রয়ী ঘটনাবর্ণনায় তুরস্ক-ইরানের কল্পনাপ্রবণ কবিমন বাধা অনুভব করে নি। ফিরদৌসীর আগে দুজন কবি ফারসীতে এই কাহিনী রচনা করেছিলেন; তাঁরা হলেন, বল্‌খের আবুল মুয়াইদ আর আহ্‌ওয়াজের বখতিয়ারী। ফিরদৌসীর 'ইউসুফ ও জুলায়খা' রচিত হয় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায়। তাঁর পর আবদুর রহমান জামী (রচনা ১৪৮৩ খৃঃ) ও হিরাটের নাজিম এই কাহিনীর কাব্যরূপ দেন। জামীর কাব্যই সবচেয়ে জনপ্রিয়।[৩]

১। Gibb & Kramers: Shorter Encyclopedia of Islam, p 646-8

২। ibid.

৩। Browne: Op. cit, p 146.

বাংলায় এই কাহিনীর প্রাচীনতম কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর। ডক্টর এনামুল হক দেখিয়েছেন যে, সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪০৯) তাঁর 'ইউসুফ জলিখা' কাব্য রচিত হয়।[১] এই হিসেবে সগীর জামীর পূর্ববর্তী। সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা আবদুল হাকিমের 'ইউসুফ জলিখা' এই পর্যায়ের দ্বিতীয় কাব্য। এরপরই গরীবুল্লাহ্‌র উল্লেখ করতে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হরিমোহন কর্ম্মকার মুল ফারসী থেকে এর একটি কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেন (১৮৫৫)।[২]

গরীবুল্লাহ্‌র 'ইউসুফ জেলেখা' কাব্যের বক্তা বদর পীর, শ্রোতা বড় খাঁ গাজী। আধ্যাত্মিক জীবনের মাহাত্ম্যবর্ণন প্রসঙ্গে তিনি 'ফোরকান' অবলম্বনে ইউসুফ-জেলেখার প্রণয়কাহিনী নিবেদন করলেন এবং পরিণামে বড় খাঁ আল্লাহ্‌র পথে ফকির হয়ে যেতে চাইলেন। তবে আমরা বুঝতে পারি যে, বদর পীরের জবানিতে করি যে কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন, তা কোরআন-অবলম্বনে নয়, ফারসী কাব্য অবলম্বনে আর সেজন্যে কোরআন-কাহিনীর সঙ্গে ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যই এর বেশী। তাই কবি আল্লাহ্‌র 'দেহ'ও কল্পনা করতে পেরেছেন, যা তাঁর মূল ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী। ইউসুফের জন্মের পূর্বে আল্লাহ্‌তা'লা

'আপনার দেহের রূপ আপনি লইয়া।
ছুরত করেন পয়দা আপনি বসিয়া॥
ছয় ভাগ রূপ আল্লা আলমে ভেজিল।
তার বিচে চারিভাগ ইউছফেরে দিল॥'

এভাবে কয়েকটি অনৈসর্গিক ব্যাপারও কাব্যে স্থান পেয়েছে। ইউসুফকে যখন তার ভাইরা প্রহার করছে, তখন ঃ

'আছমান জমিন কান্দে সূর্য্য আর তারা কান্দে
ফেরেস্তা ও কান্দে হুরপরী।'

এটা না হয় নিছক কবিত্বের কথা, কিন্তু ইয়াকুব নবী যখন ইউসুফের খাদক

১। মুহম্মদ এনামুল হক: পূর্বোক্ত, পৃ ৫৬-৬০।

২। সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৯৪৪।

রূপে বাঘকে তিরস্কার করলেন ঃ

'হায়রে নিঠুর বাঘ কঠিন তোর হিয়া।
কেমনেতে খেলে তুমি সে রূপ দেখিয়া॥'

বাঘ তখন প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করল এবং ইয়াকুবই কেবল তা শুনতে পেলেন। তারপর, জীবরাইল (আঃ) কেবল ইয়াকুব ও ইউসুফকে নয়—জেলেখাকেও স্বপ্নাদেশ দিতেন। ইউসুফের প্রার্থনায় হৃতযৌবনা জেলেখা আবার মুহূর্তের মধ্যে পূর্বরূপ ফিরে পেলেন এবং তখন ইউসুফের দেহমন তাঁর প্রতি ধাবিত হল।

এসব অনৈসর্গিক ঘটনা কেন আরোপিত হল, তার কারণ খুবই সরল—আল্লাহ্‌র গরিমা ও ফকিরীর মাহাত্ম্যপ্রচার কবির উদ্দেশ্য। হয়তো এই উদ্দেশ্য সফল হবে মনে করেই কবি আল্লাহকে ক্ষমাশীল হিসেবে চিত্রিত করেন নি, বরঞ্চ দেখিয়েছেন, মানুষের অসঙ্গত ব্যবহারে তিনি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। ইউসুফকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ না করে ইয়াকুব তাঁর অন্য পুত্রদের হাতে সমর্পণ করেছিলেন বলেই আল্লাহ্‌ 'বেদেল' হলেন এবং তাই তিনি ইউসুফকে হারালেন। ইউসুফ তন্ময় হয়ে নিজের প্রতিবিম্ব (অর্থাৎ আপন রূপ) দেখছিলেন—'এলাহি বেদেল হইল তাহার লাগিয়া' এবং এর "প্রতিফল" পেতে হবে বলে জানিয়ে দিলেন ঃ আমরাও তাঁর দুর্দশার পরিচয় পেলাম।[১] এখানে কবি যতই মূলানুগ হোন না কেন—আমাদের কিন্তু মনে পড়ে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর কথা ভক্তের সামান্য বিচ্যুতিই যাঁর শাস্তিদানের পক্ষে যথেষ্ট কারণ।

অনৈসর্গিক উপাদানের প্রাচুর্য ও ধর্মীয় বর্ণসংযোগের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলার লৌকিক প্রভাব এবং হিন্দু পারিপার্শ্বিকের ছাপ এতে দেখা যায়। যেমন ঃ

'বিদ্যায় পণ্ডিত যেন সরস্বতী পার'

বা 'ভুরু দুটি জোড়া যেন কামের কামান'

১। রূপমুগ্ধতা'র অপরাধে দণ্ড পাবার কথা 'জঙ্গনামা'য়ও আছে, যথাস্থানে তার উল্লেখ করব। সৈয়দ হামজা-রচিত 'আমীর হামজা' (দ্বিতীয় পর্বে) আমরা হজরত মোহাম্মদকেও এই অপরাধে শাস্তি পেতে দেখি।

হিন্দু প্রভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর নিম্নোদ্ধৃত অংশে স্থানীয় বর্ণসংযোগ (local colouring) সুস্পষ্ট ঃ

(১) 'বাছুর হারাইয়া যেন হামলায় গোধন।'
(২) 'ইউসুফে ভুলাব মোরা ধূলাখেলা দিয়া।'
(৩) 'চিল যেন বাচ্চা নিলে ধাড়ি যায় উড়ে।'
(৪) 'সোনার পালঙ্গে বৈসে পানগুয়া খায়।'
(৫) 'এক হাতে শঙ্খ করি আর হাতে সোনা।
পরিতে পরিতে গায় যত নারী জনা॥'
(৬) জল বিনে মীন করে··· ।'

লৌকিক প্রভাবের স্পষ্টতর পরিচয় পাই রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে। বিদ্যাপতি থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কাব্যে সংস্কৃত কাব্যানুসারী যে রূপবর্ণনার ধারার সাক্ষাৎ আমরা পাই, গরীবুল্লাহ্ সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করেই জেলেখার দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনা করেছেন ঃ

'পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মুখের ছুরাত।
ত্রিভুবন জিনে দেখি রূপের মুরাত॥
ময়ুরের পর জিনে কেশ মাথা পরে।
রাহু যেন গ্রাসিল আসিয়া চাঁদেরে॥
ত্রিভঙ্গ নয়ন যেন খঞ্জনের আঁখি।
ভুবন ভুলাতে নারে সেই রূপ দেখি॥
দুইখানি ঠোট যেন কমলের ফুল।
তাহার বদন যেন চাঁদ সমতুল॥
বত্রিশ দন্ত দেখি যেন মুক্তার হার।
বিদ্যায় পণ্ডিত যেন সরস্বতী পার॥
দুটি হাত দেখি যেন কুন্দিকার তুল।
আলতায় চিকন যেন দশটি আঙ্গুল॥

মুখের বচন যেন অমৃতের ধার।
পিঠের লোটন শোভে গজমতী হার॥
সুবর্ণের হার ফুল সুন্দরীর গলে।
দূরেতে পালায় দুঃখ ছুরত দেখিলে॥
সুবর্ণের ফুল যেন ছুলের উপর।
দুটি ঠোঁট দেখি যেন অতি সে সুন্দর॥
বুকের কাঁচলী যেন করে ঝিকিমিকি।
চন্দ্রসূর্য্য মেঘে যেন হয়ে যায় লুকি॥
অতি ক্ষীণ মাজা তার কে করে বাখানি।
চলন খঞ্জন তার দেখে ভুলে মুনি॥'

আর জেলেখার মুখে ইউসুফের যে রূপবর্ণনা আমরা শুনতে পাই, তাও একই আদর্শের ঃ

'মুখ নির্ম্মল যেন পূর্ণিমার শশী।
ভ্রমরা গুঞ্জরে যেন দুই চক্ষে বসি॥
ভুরু দুটি জোড়া যেন কামের কামান।
স্থলপদ্ম যিনি তেরা হয় দুটি কান॥
দুটি ঠোট সুরঙ্গ তেরা কমলের তুল।
দুটি হস্ত দেখি যেন কুন্দিকার তুল॥
মুখের ছুরত যেন চন্দ্রের উদয়।
এ দশ আঙ্গুল যেন চিত্র আলতায়॥
অতি ক্ষীণ মাজাখানি শিকারী বাঘিনী।
চলন খঞ্জনে হেরে ভুলে সব মুনি॥
সুগঠন মতির মালা শরীর নির্ম্মল।
যুবতী না বান্ধে মন দিতে চাহে কোল॥
চন্দ্রের গঠন যেন গৃহে কল্পতরু।
শুরঙ্গ শুরঙ্গ অতি মাজাখানি সরু॥'

নায়িকার সাজসজ্জার বর্ণনায় দেখা যায় গজমতী হার, সোনার নত, হীরের ফুল, সোনার চুড়ী, বাউটি আর সোনার চাঁপা ; তাঁর খঞ্জন নয়ন দেখা যায়, শোনা যায় কোকিলকণ্ঠ। জেলেখা মৃগয়ায় গিয়েছেন,—সেখানে কোকিলের কুহুরব, পুষ্পমধু-পানমত্ত ভ্রমর-ভ্রমরী, সমবেত খঞ্জনখঞ্জনী, নৃত্যরত ময়ুর-ময়ুরী তাঁর হৃদয়ে প্রহার হানতে লাগল। এর সবকিছুই তো বাংলা প্রণয়কাব্যে প্রচলিত রীতির অনুসরণ। এমন কি, এসব অংশে প্রচলিত-ভাষার (গরীবুল্লাহ্‌র অনুসারীরা যাকে 'সমস্কৃত' বলেছেন) অনুসৃতিই দেখা যায়। ইউসুফকে দেখে মিশরের যুবতীসমাজে যে প্রতিক্রিয়া জেগেছিল, সুন্দরকে দেখে বর্ধমানের নারীসমাজের আচরণের সঙ্গে তার ঐক্য আছে।

বাংলা কাব্যধারার সঙ্গে 'ইউসুফ জেলেখা'র এই সাদৃশ্যে কবি হিসেবে গরীবুল্লাহ্‌র মৌলিকতার দাবী ক্ষুণ্ণ হয় নি। কেননা, মধ্যযুগের সকল কবিই এই অর্থে প্রথানুগত। একই বিষয়বস্তু এবং একই ধরণের অলঙ্কার ব্যবহার করেও মধ্যযুগের প্রতিভাবান কবিরা যেমন শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন, গরীবুল্লাহ্‌ও তেমনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ কৃতিত্ব প্রধানত প্রণয়াবেগের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। জেলেখার প্রণয়োন্মত্ততা, প্রণয়ীর কাছে আত্মসমর্পণ, প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের জ্বালা, প্রণয়পাত্রকে আঘাত করার প্রবৃত্তি এবং সেই আঘাতজনিত বেদনায় আত্মদহন —এই ভাবতরঙ্গ পাঠকের হৃদয়কে অভিভূত করে তোলে। অন্যদিকে ইউসুফের স্বাভাবিক নীতিবোধ ও সহানুভূতি, প্রলোভন ও অতিপ্রাকৃত ইঙ্গিতবশতঃ লিপ্সাদমন —এটাও চমৎকার ফুটে উঠেছে। জেলেখার প্রণয়হীন জীবনের রিক্ততা ও হাহকার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে আজীজ মেছেরের মৃত্যুর পর—যখন ইউসুফের নাম শোনামাত্রই তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করতে লাগলেন, যখন উদ্‌গত অশ্রুস্রোত তাঁর দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিল। এই অবস্থায় দীর্ঘকাল পর ইউসুফের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং ইউসুফের আগ্রহ সত্ত্বেও জেলেখার অভূতপূর্ব আত্মসংযম তাঁর চরিত্রকে আরো মহনীয় করে তুলেছে। এই ঘটনায় ইউসুফ-চরিত্রের **consistency** ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকলেও তাঁর মানবীয় গুণের প্রকাশ হয়েছে। জেলেখার যে অসামাজিক প্রেম একদিন দেহের মিলনে তৃপ্তি খুঁজেছিল, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের

'দাহনে তা দেহোত্তর প্রণয়ের রূপ ধারণ করে শুচিশুভ্র হয়ে উঠল—আর তখনই তা লাভ করল অভিষ্ট পরিণতি।'[১]

অবশ্য অসঙ্গতি বা অতিশয়োক্তি কোথাও যে নেই, তা নয়। ইয়াকুবের স্ত্রী রাহিলার মৃত্যুশোকে 'তিন রোজ সহরেতে না চড়িল হাড়ি'। কবি একবার বলেছেন, জেলেখা দ্বিতীয়বার ইউসুফকে স্বপ্নে দেখেন 'এগারো বচ্ছর পর'; কিন্তু জেলেখার উক্তিতে পাই 'তিন বচ্ছর' পর। নাবালক ইউসুফকে দেখে নারীদের প্রণয়েচ্ছাও আমাদের বিশ্বাসের কাছে অতিরিক্ত দাবী করে: তারও বহুদিন পর তাঁর চোদ্দ বছর বয়স হলে জেলেখা প্রণয়নিবেদন করেন। দীর্ঘকাল পর ইয়াকুব ইউসুফের মিলনে তাঁদের উদ্‌গত আনন্দাশ্রু দেখে 'তামাম লস্কর জারেজার' হয়ে কাঁদতে লাগল।

এইসব ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও কবিত্বশক্তির প্রকাশে 'ইউসুফ-জেলেখা' গরীবুল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য বলে গণ্য হতে পারে। ইউসুফের প্রতি জেলেখার অনুরাগকে 'অনল দেখিয়া যেন ধায় যে পতঙ্গ' বলাটা কিছু নয়, কিন্তু 'দেখিয়া বাঘিনী যে শিকারের রঙ্গ' উক্তিটিতে যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা বোধহয় আজকের দিনেও পুরোনো হয়ে যায় নি।

ছয়

ফারসী ভাষায় 'কিস্‌সা-ই-আমীর হামজা' বেশ বড় কাব্যগ্রন্থ। এর লেখক কে নির্দিষ্ট করে তা বলা কঠিন। কেউ বলেন, আকবরের সভাকবি ফৈজি, অনেকের মতে, মোল্লা জালাল বলখী। জালালউদ্দীন রুমীর মসনবীতে আমীর হামজা চরিত্রের উল্লেখ আছে, তবে আমীর হামজার 'কিস্‌সা', 'দাস্তান' ও 'জঙ্গনামা' নামে পরিচিত

১। 'ইউসুফ জেলেখা'র কোন কোন বাংলা version এ তাঁদের সন্তানাদির কথা বলা হয়েছে। দ্রষ্টব্য আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: ইউসুফ জলেখা। দিলরুবা, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭। গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যে তার উল্লেখ নেই। উভয়ের মিলনের পর দ্রুতগতিতে তিনি তাঁদের মৃত্যু বর্ণনা করেছেন।

কোন কাব্য তখনো প্রচলিত ছিল কি না জানা যায় না। ফারসী থেকে মুন্শী নেওয়ালকিশোর কাব্যটির একটি উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন।[১]

সম্ভবত বাংলায় প্রথম 'আমীর হামজা' কাব্য লেখেন চট্টগ্রামের কবি আবদুল নবী ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে।[২] গরীবুল্লাহ্ 'আমীর হামজার' প্রথম পর্ব রচনা করেন আনুমানিক ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে; সৈয়দ হামজা এর দ্বিতীয় বালাম বা উত্তর পর্ব রচনা করেন ১৭৯৭ তে। গরীবুল্লাহ্-হামজার কাব্যই বাংলায় সর্বাধিক পরিচিত।

আমীর হামজা ছিলেন হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পিতৃব্য। প্রথমে ইসলাম-বিরোধী হলেও, তিনি পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং রসুলুল্লাহ্'র সঙ্গে মদিনায় হিজরত করেন। বদর যুদ্ধে তিনি বিপুল শৌর্যের পরিচয় দেন; ওহোদ-যুদ্ধে তাঁর এন্তেকাল হয় ও পিশাচী হিন্দ্ তাঁর লাশের অবমাননা করেন। তাঁর যোদ্ধাখ্যাতিকে কেন্দ্র করে কবিকল্পনা যে ভাবে বিকশিত হয়, তার ফলেই আমরা (ফারসী-উর্দুতে) আমীর হামজার কিস্সার বিরাটায়তন কাহিনী পেয়েছি।[৩]

আবদুল মোতালেবের আন্তরিক পুত্রকামনার ফলে আমীর হামজার জন্ম হয়ঃ

'পয়দাস নবীর আগে তুড়িল কুফর লোকে
এয়ছা সেই হইল নেকমর্দ্দ।'

তিনি ও তাঁর বন্ধু উম্মর উম্মিয়া যুদ্ধ করে মকবেল হলবি ও মঞ্জুর সাহাকে পরাস্ত ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন—যদিও ইসলামের নবী তখনো জন্মান নি। সেই থেকে শুরু হল হামজার অসংখ্য যুদ্ধবিগ্রহ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত শত্রুকে ইসলামে দীক্ষাদান। শেষদিকে দেখা যায় যে, খোওয়াজ খিজিরের কাছ থেকে রসুলুল্লাহ্'র খবর পেয়ে আমীর হামজা 'একিদায় আনিল ইমান'। এ সত্ত্বেও, যেমন কবির কাছে, তেমনি পাঠকের কাছে, হামজার অসংখ্য যুদ্ধবিগ্রহ ইসলাম প্রচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও জেহাদরূপেই পরিগণিত হয়ে এসেছে।

১। Abdul Wali: Op. cit.

২। মুহম্মদ এনামুল হক: পূর্বোক্ত, পৃ ১২৭।

৩। Gibb & Kramers: Op. cit.

'আমীর হামজা' কাব্যে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার বাহুল্য আছে। এটা যে এই ভাষারীতির কাব্যের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য, সে কথা আগেই বলেছি। এই কাব্যের পাত্রপাত্রীর তালিকায় 'দেও' ও 'পরী'রা একট বড় অংশ জুড়ে আছে। স্বপ্নে ও প্রকাশ্যে লোকান্তরিত নবীদের প্রবেশ ও প্রস্থানও সচরাচর ঘটনা। 'জঙ্গনামা'গুলোয় আবার বিশেষ করে কাল্পনিক খোওয়াজ খিজিরের আবির্ভাব এবং নায়কের সহায়তা করে প্রত্যাবর্তন করতে দেখা যায়—এখানেও তাই দেখতে পাই। দেওরা যেমন মানুষের স্কন্ধে আরোহণ করে বিচরণ করতে থাকে, তেমনি পরীতে-মানুষে বিবাহ হয়; মানুষের ঔরসে ও পরীর গর্ভে যেমন সন্তানের জন্ম হয়, তেমনি দেও-পরীর মিলনে জন্ম হয় দ্রুতগতি অশ্বের।[১] বিশ শত গজ উঁচু প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করে নায়ককে জয়যুক্ত হতে হয়। ঘটনার স্থান ও কালও সুবিস্তৃত। এর উপরে মানুষের ভুলের জন্যে 'বেদিল' আল্লাহ্ শাস্তি দিয়ে সমস্যাকে জটিল ও সমাধানকে দীর্ঘতর সময়সাপেক্ষ করে তোলেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে:

'যখন আমির গেল পরি লিয়া সাথ ॥
এলাহির নাম আগে মুখে নাহি লিল।
আঠারো দিনেতে ফিরে আসিব কহিল ॥
এ খাতেরে আল্লাতালা গোস্বা তার পর।
আঠারো দিনেতে হবে আঠারো বচ্ছর ॥'

হলও-তাই। কারণ, কবিকল্পনার আল্লাহ্ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মতো করুণা ও ক্রোধ বর্ষণ করেন কেবল বান্দার মনে সদা জাগরুক থাকতে চান বলে।

এই অতিপ্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে আমীর হামজা কাব্যের একটি ছদ্ম-ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। কবি বলছেন, দুনিয়ার মধ্যে মদিনার ভিতরে কোবাদের রাজত্ব—কোবাদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নওশেরওয়াঁ রাজত্ব পেলেন: এই নওশেরওয়াঁর শৈশবে হামজার জন্ম হয়। পারস্যের সাসানীয় বংশের

১। 'আমীর হামজা'র দ্বিতীয় পর্বে **immaculate conception**এরও দৃষ্টান্ত আছে।

নৃপতি নওশেরওয়াঁর (খুসরৌ-আনুশিরওয়াঁ : রাজত্বকাল ৫৩১-৭৮ খৃঃ) পিতার নাম কোবাদ ছিল। তাঁর রাজত্বকালে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জন্ম হয়। এখানে রাজার নাম ঠিক আছে, কিন্তু রাজ্যের বদল হয়ে গেছে। নওশেরওয়াঁ যে আরব ছিলেন না, তা বোধহয় কবি জানতেন। কেননা, পরীরাজ্যে হামজার দেরী হওয়ায় :

'তামাম কুফর শুনে বড়ই খোসাল।
মরিল তুরুক নেড়ে আরব্ব জঞ্জাল ॥
এতদিনে মারা গেল রাক্ষসের হাতে।
চল ভাই যাই সবে আরব্বে লড়িতে ॥'

এখানে দেখা যায় যে, নওশেরওয়াঁ আরব-বহির্ভূত কোন দেশ থেকে যুদ্ধ করতে আসছেন, অথচ, কবির সাক্ষ্যমত, তাঁর আসার কথা মদিনা থেকে। তাই মনে হয় যে, মদিনাকে কবি আরবের বাইরের কোন স্থান বলে গণ্য করেছেন অর্থাৎ শুধু মক্কাকেই আরব দেশ বলে মনে করেছেন।

উদ্ধৃত পংক্তিতে 'তুরুক' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্যনীয়। 'তুরুক' বলতে কবি বা তাঁর পাত্রপাত্রীরা তুর্কী বোঝেন নি : 'মুসলমান' অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে ('নেড়ে' শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)। আগে লৌকিক প্রভাব বলতে যা বোঝাতে চেয়েছি, এই শব্দদুটির প্রয়োগ থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়। তুর্কী মুসলমানেরা বাংলা দেশ জয় করেছিলেন বলে বাংলায় 'মুসলমান' অর্থে 'তুরুক' শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার আমরা দেখেছি।[১] শুধু 'আমীর হামজা'য় নয়, জঙ্গনামা-শ্রেণীর অন্যান্য কাব্যেও এই দুই শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়।

১। যেমন, বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'য় আছে :

'হিন্দু তুরকে মিলল বাস।
একক ধম্মে অওকো উপহাস ॥'

সুকুমার সেন : মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী-তে উদ্ধৃত।

পূর্বোদ্ধৃত চরণগুলোয় 'রাক্ষসে'র আমদানীও লক্ষ্যনীয়। রামায়ণ-কাহিনীর অরুপণ উল্লেখ 'আমীর হামজা' কাব্যে স্থানীয় প্রভাবের পরিচয় দেয়ঃ

(১) 'নানারূপ ধরে যেন বীর হনুমান।
আল্‌কুমা চাম্বরি দেখে হৈল পেরেসান॥
রাক্ষস্ গন্ধর্ব দেও পরি কিবা হয়।'

(২) 'কোন ছলে আইল বুঝি বীর হনুমান।
নহে কি এমন ফেরে বাতাস সমান॥
যেকালে রাবণ সাথে লড়িল বানর।...'

(৩) 'দেও কিম্বা রাক্ষস লঙ্কার।'

(৪) 'রাবণের গড় যেন কনকের লঙ্কা।'

'আমীর হামজা'য় লৌকিক বর্ণসংযোগের পরিচয় আরো আছে। বক্তাক উজির নওশেরওয়াঁকে যা বোঝালেন, তা এ দেশের কন্যার পিতাকে বললেই শোভা পায়ঃ

'লায়েক যাহার বেটি বেহা নাহি দেয়।
পরিণামে বড়ই সরম সেই পায়॥'

তারপর, নওশেরওয়াঁ যুদ্ধযাত্রা করছেন একলাখ রায়বেশে ও চোদ্দ হাজার ঢালি সঙ্গে নিয়ে। যুদ্ধবর্ণনায় দেখিঃ

(১) 'গিরিল কুফর যেন কলাগাছ ঝড়ে।'

(২) 'বাঘ যেন গরু পরে ধাইল ময়দানে।'

যুদ্ধজয়ী হামজা কি করলেন? নাঃ

'যতকে মূরত ছিল দেবমূর্ত্তি তাড়াইল
মোসলমান বামনে করিয়া।'

শুধু কি তাই! গোস্তহামকে নিহত করে যখন হামজা ফিরে আসছেন, তখন রাখাল তাঁর পরিচয় জেনে নিবেদন করলঃ

'দেলে ছিল তেরা আমি মছলত পাব।
মুসলমান হইয়া আমি মতলব কহিব ॥
আমির কহেন কহ কি তেরা মতলব।
রাখাল দেলের বাত কহিলেন সব ॥
ছিরুপুর গাঙ (গাঁও) নামে আবাদ সকল।
ছিরুপাল নামে সেই গাঙের মণ্ডল ॥
হুরপরী জিনিয়া তাহার এক বেটি।
এক রোজ দেখে তায় প্রাণ ছটপটি ॥'

কবিকল্পনার কি মহিমা! আরব দেশে ছিরুপুর গ্রামের মোড়ল ছিরুপাল আমীর হামজার অনুরোধে সপরিবারে মুসলমান হল এবং রাখালকে কন্যাদান করল। এবারে কবিকথিত নীতিবাক্য শুনন ঃ

'যেই যাহা রোপে গাছ সেই ফল ফলে।
বদি কৈলে নেকি নাহি হয় কোনকালে ॥
কেবা কোথা শুনিয়াছে বেল গাছে আম।
যেই যাহা করে তাহা পায় পরিণাম ॥'

এইসব অংশে সুদূর আরব-ইরান থেকে চোখ ফিরিয়ে কবি তাঁরই আশেপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

রূপবর্ণনায়ও কবি দেশীয় রীতির ব্যবহার করেছেন ঃ

'চান্দকে জিনিয়া রূপ ছেরে কেশ তার ॥
কোকিলের স্বর যেন মুখে বলে বাত।
চক্ষের পুতলি যেন সুগঠন হাত ॥

এ হল নওশোরওয়ঁার শিশুকন্যা মেহের নেগার। তিনি যখন যৌবনে পদার্পন করলেন, তখন দেখা গেল ঃ

'চাহনি মদন বান দেখিলে হারায় প্রাণ
ভুরু দুটি যেমন কামান।'

তারপর তাঁর সাজসজ্জাও একেবারে এদেশী—স্বর্ণহার, নথ, গজমতি, নুপুর, কপালে তিলক, বাজুবন্ধ প্রভৃতি হল আর উপকরণ। দূর থেকে এই মেহের নেগার ও আমীর হামজা পরস্পরকে দেখে মুগ্ধ হন। এরপর তাঁদের গোপনে সাক্ষাৎকার ঘটে, মেহের মুসলমান হন ও তাঁদের অঙ্গুরীয় বিনিময় হয়। কোতোয়াল আবার এটা দেখে ফেলেন, ফলে বীরশ্রেষ্ঠ হামজা পলায়ন করলেন এবং পরে আবার সুড়ঙ্গপথে মেহের নেগারের কাছে যাতায়াত করতে থাকলেন। এই ঘটনা অনিবার্যভাবেই আমাদেরকে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই জাতীয় কাহিনীর একটি প্রধান লক্ষণ রূপমুগ্ধতা—হামজা-চরিত্র দিয়ে সেটা উপলব্ধি করা যায়। মেহের নেগারের সঙ্গে প্রথম দৃষ্টিবিনিময় তাঁর হৃদয়ে প্রগাঢ় প্রণয়ের সূচনা করল এবং পরিণামে এই প্রণয় পরিণয়ে রূপান্তরিত হল। মেহেরের জন্য হামজার হৃদয়াবেগ তীব্র ঃ তবু পরিণয়ের কি পূর্বে, কি পরে, আত্মসংযমের কোন প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন নি। তাই লন্ধরের পরাজয় উপলক্ষ্যে গোস্তহাম-আয়োজিত নৃত্যগীতানুষ্ঠানে দুই বাঁদীর সৌন্দর্য দেখে তিনি 'আসক' হয়ে পড়েছিলেন, যার ফলে তাঁর প্রাণসংশয়ও দেখা দিয়েছিল। মেসেরে যুদ্ধ করতে যেয়ে আজীজকে সিংহাসনচ্যুত করে তিনি যখন নাসিরকে রাজত্ব দিলেন, তখন কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ নাসির 'বেটি বেহা দিল তার আমীরের ঠাঁই'। আবার সহরস্থানে গিয়ে পরীসম্রাট আরজকের কন্যা তারাকে 'দেখিয়া আমীর তারে হৈল বে আরাম' এবং 'আসক আগুন দেলে উঠিল জ্বলিয়া'। তারা পরীর সঙ্গে তাঁর পরিণয় ও তাঁদের কন্যা কুরসির জন্মলাভ পর্যন্ত এই আগুন অনির্বাণ ছিল। কিন্তু তারপরই মেহের নেগারকে মনে পড়ায় তিনি স্ত্রীকন্যা ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন এবং পরিশেষে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। নদীর প্রবাহ যেমন মূল খাতে বয়ে চলেও ছোট বড় শাখা নদীর সৃষ্টি করে নিজেকে প্রসারিত করে দেয়, তেমনি মেহের নেগারকে একান্ত করে পাওয়ার জন্যে হামজার যে অভিযান, তারই পথে আরো বহু নারীসঙ্গ তিনি লাভ করলেন—তাতে তাঁর প্রেমের অমর্যাদা হয় নি বলেই কবির বিশ্বাস। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; কেননা, সে যুগে একনিষ্ঠতা ছিল নিতান্তই নারীর কর্তব্য—পুরুষের নয়। তাই

নির্বীর্য স্বামীর পত্নী জোহরা ছাড়া আর সব নারী চরিত্রই পতির প্রতি বিশ্বস্ত। আর জোহরা যে স্বামীর জীবদ্দশায়ই মকবেল হলব্বিকে বিবাহ করলেন, তার পশ্চাতে ইবরাহীম নবীর স্বপ্নাদেশ থাকায় ঘটনাটা ধর্মীয় কর্তব্যপালনের রূপ নিয়েছে—ফলে নারীসমাজের আদর্শে আঘাত লাগে নি। তবুও আরজক সাহার মুখে যে কথা আমরা শুনতে পাই, সেটা সেযুগের বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়ঃ

'আওরত বদজাত কভু ভালো নাহি বোঝে।
নেকজাত এক কভু হাজারের মাঝে ॥'

এই কাব্যে আমরা যেসব প্রধান চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, তাঁরা হচ্ছেন আমীর হামজা, নওশেরওয়াঁ, বক্তেক উজির, বুজরচেহ মেহের, উমর উম্মিয়া উমর মাদির, মকবেল হলব্বি ও মেহের নেগার। কিন্তু সাধারণতঃ এঁরা আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন নি। অর্থাৎ এঁরা যত না individual তার চাইতে অনেক বেশী typical। আর একই রকম ঘটনা ও মনোভাব ঘুরে ঘুরে দেখা দিয়েছে বলে ঘটনার মতো চরিত্রগুলোও একঘেঁয়েমীতে ম্লান হয়ে গেছে। শান্তস্বভাব ও জ্ঞানবৃদ্ধ বুজরচেহ মেহেরের বৈশিষ্ট্যই বরঞ্চ আমাদের দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট করে।

'আমীর হামজা' কাব্যে এবং অন্যান্য 'জঙ্গনামা'য় ইসলাম প্রচারের যে রূপ আমরা দেখতে পাই, তা কতখানি ইসলামের আদর্শসম্মত, এ প্রশ্ন সহজেই উত্থাপন করা চলে। সর্বত্র দেখা যায়, পরাজিত ব্যক্তি জীবনরক্ষার দায়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করছে। কবি একবার তো প্রকাশ্যেই বলেছেন, 'তারা মনে ডরাইয়া রহে মোছলমান হইয়া'। তরবারির সাহায্যেই এখানে রাজ্যের ও ধর্মের বিস্তার ঘটেছে—ধর্মমতের মাধুর্য ও ঔদার্যের জন্য নয়।

তবুও কবি তৃপ্ত হয়েছেন। তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল এমন একটি বীর চরিত্র গড়ে তোলা যিনি এইভাবে ছলে বলে কৌশলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ধর্মের মহিমা প্রচার করবেন।

সাত

ফারসী মূল[*] অবলম্বনে গরীবুল্লাহ্ আরো একটি কাব্য রচনা করেছিলেন, যার নাম 'মোক্তাল হোছেন বা জঙ্গনামা'। এই কাব্যের বিষয়বস্তু কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিয়ারা বেশ ভালরকম শিল্পসৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে আরব, তুরস্ক ও বিশেষ করে ইরানে খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে 'তাজিয়া' অনুষ্ঠান। 'তাজিয়া'র অভিনয়ে হাসান, হোসেন প্রভৃতি চরিত্রের রূপদানেও তাঁরা ক্ষুণ্ণ হন না। শিয়ারা অবশ্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে কারবালার ইতিহাসকে বিকৃত করে 'তাজিয়া'র কাহিনী গঠন করেছেন। হাসানের মৃত্যুর জন্যে এজিদের সরাসরি দায়িত্ব শুধু শিয়ারাই দাবী করে থাকেন: এজিদ হোসেনের খণ্ডিত শির দাবী করেছিলেন, এ ধারণাও সর্বসম্মত নয়। তাছাড়া, হাসান-হোসেনের মৃত্যু সম্পর্কে জিবরাইল (আঃ) হজরত মোহাম্মদকে আগেই জানিয়ে দিচ্ছেন অথবা কারবালার বিষাদময় ঘটনাকালে বেহেশ্‌তে অন্যান্য নবীরাও সম্মিলিত হয়ে শোকপ্রকাশ করছেন, এই সব কাল্পনিক ঘটনাও 'তাজিয়া'য় দেখানো হয়ে থাকে।[১]

পাক-ভারতে মহররম উৎসবে শিয়ারাও 'তাজিয়া' ব্যবহার করে থাকেন—কিন্তু অভিনয় নয়, শোকপ্রকাশই এখানে মুখ্য। রথযাত্রা ও দুর্গাপূজোর প্রতিমা-বিসর্জনের অনুকরণেই বাংলা দেশে 'তাজিয়া' বহন করার ও পানিতে ডুবিয়ে দেবার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে বলে মনে হয়।

কারবালার করুণ কাহিনী নিয়ে ফারসীতে সমৃদ্ধ 'মর্সিয়া' কাব্যও গড়ে উঠেছে। মুহতাশাম কাশানীর (মৃত্যু ১৫৮৮) হয়ত বন্দ্‌' তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। তাছাড়া, উইসাল, উইকার, সাবাহী, বিদিল, কাআনী, হুসেন ওয়াইজ-ই-কাশিফী, রিজা কুলী খান, ইসমাইল খান সারবাজ প্রমুখের রচনাও উল্লেখযোগ্য।[২]

১। Gibb & Kramers : Op. cit., p 590-91.

২। Browne : Literary History of Persia, Vol. IV, pp 172-1৮4.

বাংলায় কারবালা-কাহিনীর প্রথম কাব্যরচনার গৌরব সম্ভবত দৌলত-উজীর বাহরাম খানের প্রাপ্য।[১] তাঁর পর মোহাম্মদ খান সুবিখ্যাত 'মকতুল হোসেন' কাব্য রচনা করেন (১৬৪৫-৪৬ খৃঃ)।[২] অবশ্য এর আগেই একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ ফয়জুল্লাহ্ লিখেছিলেন 'জয়নালের চৌতিশা' —যদিও কারবালা-কাহিনীর আনুপূর্বিক ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেন নি।[৩] মোহাম্মদ খানের পর সপ্তদশ শতাব্দীতে আবদুল হাকিম লিখেছিলেন 'কারবালা', অষ্টাদশ শতাব্দীতে হায়াত মামুদ লিখেছিলেন 'জঙ্গনামা' ও সেরবাজ লেখেন 'কাসেমের লড়াই।'[৪] রাধাচরণ গোপ নামে এক হিন্দু কবিও লিখেছিলেন 'ইমামের জঙ্গ'।[৫] উনিশ শতকে সাদ আলী ও আবদুল ওহাব 'শহীদে কারবালা' নামে বড় আকারে যে কাব্য প্রণয়ন করেন, সেটাই সবচেয়ে প্রচলিত।

বিষয়বস্তুর গুণে এই কাব্যে শিয়া ভাবধারার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। শিয়াদের রাজকীয় প্রবণতার কথা আমরা জানি বলেই কবির মুখে যখন শুনি:

'… তারপরে পুছে বাত রছুলের ঠাঁই।
তোমার পিছেতে কেবা করিবে বাদসাই॥
রছুল বলেন যদি পুছিলে আমারে।
আবুবকর বাদসা হইবে মেরা পরে॥'

তখন ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শের জায়গায় এই 'বাদসাহী'র সংবাদে একেবারে বিস্মিত হই নে। হাসান হোসেনের মৃত্যু সম্পর্কে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ভবিষ্যদ্বানী ছাড়াও একটি বিস্ময়কর উক্তি বসানো হয়েছে তাঁর মুখে:

'হোছেন সহিদ হবে জেনেছিনু মনে।
আপনে কয়েছে আল্লা কেতাবে কোরাণে॥'

১। আহমদ শরীফ: পুথি-পরিচিতি, পৃ ৩৮৬।

২। মুহম্মদ এনামুল হক: পূর্বোক্ত পৃ ১৯০।

৩। মুহম্মদ এনামুল হক: পূর্বোক্ত, পৃ ৯০।

৪। মুহম্মদ এনামুল হক: পূর্বোক্ত, পৃ ২০৯, ২২৯ ও ২৫৮।

৫। সুকুমার সেন: ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ ৪৯।

শুধু তাই নয়। কারবালার এই ট্র্যাজেডীর ইতিহাস কবি শুরু করেছেন সুদূর অতীত থেকে। ইসমাইলের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে ইবরাহিম নবী প্রশংসাসূচক ধ্বনি করেছিলেন। স্রষ্টার বদলে সৃষ্টির প্রশংসা করায় আল্লাহ্ তা'লা 'গোস্বাদেল' হলেন এবং ইসমাইলকে কোরবানী দিতে আদেশ করলেন। আল্লাহ্র প্রতি সমর্পিতপ্রাণ নবী পুত্রকেই কোরবানী দিতে গেলেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে নিরস্ত করে বললেন যে, ইসমাইলের বংশধরেরা ঃ

'মহিম করিবে সেই কারবালার উপর।
তাহাতে কোরবানী তেরা কবুল আমার॥'

কোরবানীর মূল ত্যাগের আদর্শ গেল বিলুপ্ত হয়ে—কেবল এক আত্মসচেতন স্রষ্টাকেই আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করি—নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের সামান্যতম বিস্মৃতিতেই যিনি ক্রুদ্ধ হন এবং যাঁর সন্তুষ্টিবিধানের জন্যে নিরাপরাধকে বলিদানের প্রয়োজন হয়। অতএব, হাসান-হোসেনের মৃত্যু আদর্শ ও সত্যের জন্যে আত্মত্যাগ নয়—পূর্বপুরুষের অজ্ঞানতাপ্রসূত পাপের নিয়তিনির্ধারিত প্রায়শ্চিত্ত মাত্র।

এই কাব্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাল্পনিক ঘটনা স্থান পেয়েছে। আম্বাজের পরাক্রান্ত রাণী হনুফাকে বলে পরাজিত করে হজরত আলী তাঁকে বিবাহ করেন। এতে নবীদুহিতা ফাতেমা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত হন। বিবি হনুফা যখনই একটি করে সন্তানের জন্ম দিতেন, বিবি ফাতেমা এক হাঁক দিয়ে নবজাত শিশুর মৃত্যু ঘটাতেন। এভাবে এগারোটি সন্তানের পর জন্মাল এক পুত্র। ভীত আলী তাকে রসুলের পায়ের উপর ফেলে দিলেন। তিনি তাকে সস্নেহে তুলে নিয়ে নিজের ও শিশুর মায়ের নাম মিলিয়ে তার নামকরণ করলেন মোহাম্মদ হানিফা। সপত্নীপুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ দেখে বিবি ফাতেমা ক্রুদ্ধ হয়ে হজরতকে বলেন ঃ

'বিবিজাদার মুখ নাহি কর নিরীক্ষণ।
ঘন ঘন বান্দিজাদার করহ চুম্বন॥
তোমার চরিত্র আর কতবা বুঝিব।
ভাল নহে এয়ছা কাম কি আর বলিব॥

রসুল কহেন আমি যার করি হিত।
মোর হেন নসিবে সে বোঝে বিপরীত॥'

তারপর তিনি ভবিষ্যত কারবালাক্ষেত্রে হানিফার ভূমিকা বিবৃত করলেন, ফাতেমা তখন হানিফাকে কোলে নিয়ে মুখচুম্বন করলেন। কবিত্বের সঙ্গে অলৌকিকতা প্রকাশের নেশা চেপে পয়গম্বরপুত্রীকে যে পরম স্বার্থপর ও সপত্নীপুত্রবিদ্বেষী রূপে অঙ্কন করল, ভাবমুগ্ধ কবি তার কোন তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না।

প্রচলিত মকতুল হোসেন কাব্য অবলম্বনে মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' রচিত হওয়ায়, সামান্য অনৈক্য সত্ত্বেও আলোচ্য কাব্য ও 'বিষাদ সিন্ধু'র কাহিনীভাগ একই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাবে মশাররফ হোসেন (এজিদের) রূপমুগ্ধতাই বড় করে তুলে ধরেছেন 'বিষাদ-সিন্ধু'তে; 'জঙ্গনামা'য় বড় হয়ে উঠেছে অসাধারণ ও অস্বাভাবিক বীরবিক্রম। যেমন, যুদ্ধক্ষেত্রে ওহাবের

'সের কাটা গেছে তবু বলে মার মার'

কিংবা 'দুই পাও (পা) ধরিয়া ফাড়িল খারিজিরে।
চাদর ফাড়িয়া যেন দুই ফাক করে॥'

মনে রাখতে হবে যে, এইসব যোদ্ধাদের শারীরিক অবয়বও সাধারণ মানুষের মতো নয়—তাদের দেহ অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চান্ন গজ দীর্ঘ।

পরিবেশ-সচেতনতার উদাহরণস্বরূপ এই কাব্যের একটি কৌতূহলজনক উপাখ্যানের উল্লেখ করি। 'বিষাদ সিন্ধু'র পাঠকের কাছে আজরের আত্মত্যাগের কাহিনী সুপরিচিত।[১] গরীবুল্লাহ্‌র উপাখ্যানে সেই কাহিনী এভাবে রূপ পেয়েছে: দামেস্ক শহরে 'মুখুর্যা কুলেতে জন্ম নাম চন্দ্রভান' এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। হোসেনের খণ্ডিত শির নিয়ে জেয়াদ তাঁর গৃহে রাত্রিযাপন করল। চন্দ্রভান হোসেনের মস্তক দেখে গলায় কাপড় দিয়ে সালাম করে বললেন:

১। মীর মশাররফ হোসেন: বিষাদ সিন্ধু। উদ্ধার পর্ব: দ্বিতীয় প্রবাহ।

'বড় সাদ ছিল তোমার কাছে গিয়া।
মুরিদ হইব আমি কলেমা পড়িয়া॥'

আশ্চর্যের বিষয়, হোসেনের খণ্ডিত মস্তকও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। সকালবেলা ব্রাহ্মণ এক খাঁড়া নিয়ে বের হলেন, ব্রাহ্মনী তুলে নিলেন 'সালগ্রাম পাথর'—হোসেনের ছিন্নমস্তক তাঁরা জেয়াদকে দেবেন না। জেয়াদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেয়ে একে একে তাঁরা মৃত্যুবরণ করলেন। এভাবে কবি দেখালেন ইসলামের অপূর্ব মাহাত্ম্য আর বলে দিলেন, 'এমাম খাতেরে সবে বেহেস্ত পাইল'। পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সচেতনতার ফলেই কবি ব্রাহ্মণকে ইসলামভক্ত করে তুললেন—বাস্তবতার প্রশ্ন তাঁর মনেও এল না। আর শুধু তাই নয়, তাঁর অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থাও করলেন—কোনরকম সংকোচবোধ করলেন না।

উপমার প্রয়োগেও পরিবেশের প্রভাব আছে। যেমন:

(১) 'বরষাতে মাছ যেন স্রোতমুখে ধায়।
যেথা মন সুখে থাকে নালা ডোবা পায়॥
যখন কাত্তিক মাসে কমে আইসে জল।
কি হবে কোথায় যাব হইয়া বিকল॥'

(২) 'যেমন কৃষাণ আছাড়ে ধান্য বিড়া।
হাড়গোড় গেল গিধি চূর্ণ হইল হেড়া॥'

(৩) 'অগাধ জলেতে যেন ডুবে পানকড়ি।'

(৪) 'যেন গাছ কর্ম্মকার চিড়িল করাতে।'

(৫) 'যেন সের মুড়াইয়া করিল অপমান।'

এই সঙ্গে উদ্ধৃত করি হোসেনতনয়া ফাতেমার বর্ণনা:

'পাঁচ বৎসরের সেই ফাতেমা তার নাম।
পুর্ণিমার চাঁদ যেন রূপে অনুপাম॥
বদন বিকস রূপে যেন চন্দ্রমাসা।
অধর বিম্বক ফল কোকিলের ভাসা॥

কিবা রূপ শোভা করে তার দুই উরু।
যেন উলটিয়া পড়ে কদলীর তরু॥
'ক্ষণে ক্ষণে দুই পায় চম্পক আঙ্গুলী।
জেওরাতে শোভা যেন করিয়াছে মিলি॥'

প্রথাবদ্ধতার স্রোতে গা ভাসিয়ে কবি নায়িকার রূপবর্ণনা করেছেন, কিন্তু স্মরণ রাখেন নি যে তাঁর বর্ণনীয় বিষয় পাঁচ বৎসরের শিশু মাত্র। অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কবি গতানুগতিক। যুদ্ধের বর্ণনায় কলাগাছ-কাটা, ছাগলের পালে বাঘ, হাতীর দলের উপর সিংহ প্রভৃতি সুপ্রচলিত উপমা ব্যবহার করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরকে অশিষ্ট ভাষায় গালাগালির প্রতিযোগিতা শালীনতার সকল সীমা ডিঙ্গিয়ে গেছে। তবে অত্যন্ত সুন্দর করে প্রকাশ করা হয়েছে হোসেনের মৃত্যুর মুহূর্তটি ঃ

'দুই হাতে এমাম গলায় ফেরাইল।
এমামের দুই হাত লহুতে ডুবিল॥
লহুভরা দুই হাত এমাম উচা করে।
এমামের লহু গেল আছমান উপরে॥
আছমান উপরে লহু ছিটকিয়া লাগিল।
সিন্দুরিয়া মেঘ হয়ে আছমানে রহিল॥
আজিতক সেই মেঘ উঠে যে আছমানে।
হোসেনের সহিদের লহু জান সর্বজনে॥'

সমস্ত কাব্যের মধ্যে এই অংশটি নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ।

আট

হজরত আলীর বীরত্ব ও অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে শিয়ারা নানা উপাখ্যান সৃষ্টি করেছেন। কিংবদন্তী এই যে, তাঁর ঔরসে ও আম্বাজাদী বিবি হনুফার গর্ভে মোহাম্মদ আল-হানাফিয়া নামে এক বীর জন্মগ্রহণ করেন। কারবালার যুদ্ধে হোসেনের শাহাদাৎপ্রাপ্তির পর তিনিই এজিদকে পরাজিত করে হোসেন-পরিবারকে

উদ্ধার করেন এবং পরে নাকি আল্লাহর ইচ্ছায় এক পর্বতগহ্বরে বন্দী হন। যাইহোক, আলীর মতো মোহাম্মদ হানিফা সম্পর্কেও অনেক বীরত্বের উপাখ্যান প্রচলিত আছে—বিশেষ করে ফারসীতে।

সাবিরিদ খান[১] বিরচিত 'হানিফা ও কয়রাপরী' সম্ভবত বাংলায় লেখা এই ধরণের প্রথম কাব্য। ডক্টর এনামুল হক মনে করেন যে, এই কাহিনী কবির স্বকপোলকল্পিত।[২] এই ধারার অন্য দুটি কাব্য—মোহাম্মদ খানের 'হানিফার লড়াই'[৩] (সপ্তদশ শতাব্দী) ও সৈয়দ হামজার 'জৈগুনের পুথি' (১৭৯৭ খৃঃ)র সঙ্গে হানিফা ও কয়রাপরী'র উপাখ্যানগত সাদৃশ্য থাকায় মনে হয় যে, এঁদের সকলের অবলম্বন ছিল কোন উর্দু বা ফারসী কাব্যকাহিনী। উল্লেখিত কাব্যগুলো ছাড়াও, কারবালা-উপাখ্যানগুলোয় হানিফার বীরত্বকাহিনী আছে এবং আরো অনেক কবি হানিফার যুদ্ধকাহিনী রচনা করেছেন।[৪]

হানিফার ত্রয়োদশম যুদ্ধের কাহিনী 'সোনাভান' কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। গল্পাংশ সংক্ষেপে এইঃ টুঙ্গি শহরের 'বাদশা' সোনাভান বীরত্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। উজিরের কাছে আলীতনয় হানিফার বীরত্বের কথা শুনে সোনাভান তাঁকে পরাজিত করার সংকল্প করলেনঃ

'ঠাকুরের জোরে আমি করি এত জোর।
নহে কি বড়াই করি সাধ্য কিবা মোর॥
একথা শুনিয়া আল্লা হইল বেজার।
কার খায় কার গায় বড় অবিচার॥'

১। অধ্যাপক আহমদ শরীফ দেখিয়েছেন যে, সাবিরিদ খান ১৪৮০ থেকে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।—বিদ্যাসুন্দরের কবিঃ দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খান। সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা ১৩৬৪।

২। মুহম্মদ এনামুল হকঃ পূর্বোক্ত, পৃ ১০৮।

৩। মুহম্মদ এনামুল হকঃ পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৭।

৪। আহমদ শরীফঃ পুথি পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

আল্লাহ্ তখন হানিফাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন : 'জোরেতে ধরিয়া তুমি সাদী কর তারে' (সোনাভানকে)। হানিফার কাছে তো 'আওরতের বাদসাই' অসহ্য, তার উপরে বিবি ফাতেমা (হানিফার বিমাতা) ইন্ধন জোগালেন :

'আওরত হইয়া সে করে এত জোর।
যাইয়া সাজাই কর কিবা ডর তোর॥'

কিন্তু— 'একথা শুনিয়া আল্লা হইল বেজার।
আজ কেন নাম বিবি ভুলিল আমার॥
থোড়াই সাজাই দিব হানিফার তরে।
দেখিব ফাতেমা বিবি কি করিতে পারে॥'

অতএব ফাতেমার অপরাধে হানিফার শাস্তি শুরু হল। স্বপ্নে সোনাভান তাঁর কাছে দেহ নিবেদন করলে বিবাহের প্রস্তাব করলেন হানিফা, কিন্তু তা রূপায়িত হবার আগেই তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হল এবং প্রণয়োন্মাদ হয়ে তিনি সোনাভানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। এক পীরের নির্দেশমত এসে পড়লেন টুঙ্গি শহরে, তারপর এক বৃদ্ধাকে দূতী করে পাঠালেন সোনাভানের কাছে বিবাহপ্রস্তাব দিয়ে। বৃদ্ধা প্রথমটায় একটু বিস্মিত হল :

'তুমি মুসলমান হইলে তারা তো ব্রাহ্মণ।
তেরা সাথে সাদী হবে একথা কেমন॥'

যাহোক, সোনাভানের কাছ থেকে এ দূতী লাঞ্ছনা পেয়ে ফিরে এলে হানিফা 'হাজার মণের গোর্জ্জ বগলে দাবিয়া' যুদ্ধ করতে এলেন। আর সোনাভান

'দুধে জলে ত্রিশমণ করিল জলপান।
আশিমণ খানা ফের খায় সোনাভান॥
হাজার মণের গোর্জ্জ তুলে নিল হাতে।
আছিল লোহার জের পরিল গায়েতে॥'

প্রথম যুদ্ধে হানিফার পরাজয় ঘটল। দ্বিতীয়বার হানিফা প্রায় বিজয়ী হয়েছিলেন, এমনি সময়ে বীরত্বের বড়াই করায় তাঁর উপর 'আল্লা বেজার হইল' এবং আবার তিনি পরাজিত হলেন। সোনাভান স্বহস্তে তাঁর মস্তক ছেদন করতে গেলেন ;

তয়ে বীর হানিফা স্বয়ং এবং আসমান-জমিন পশুপক্ষী ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় জিবরাইল স্বপ্নে বিবি ফাতেমাকে খবর দিলেন—আলী এসে হানিফাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন।

সোনাভানকে বলপ্রয়োগে বিবাহ করবেন, এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে হানিফা আবার এলেন। কিন্তু এবারও সোনাভানের জয় হল, কেবল স্ত্রীধর্মের অনুরোধে হানিফাকে প্রাণে বধ না করে সিন্দুকে বন্ধ করে কহর দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলেন; কিন্তু খোওয়াজ খিজির তাঁকে কোলে করে নিরাপদে রাখলেন। স্বপ্নে ফাতেমা আবার সকল বৃত্তান্ত অবগত হলেন। হাসান-হোসেন গেলেন হানিফার তিন পত্নী মল্লিকা, সমর্ত্তভান ও জৈগুনের কাছে। স্বপ্নে জৈগুন হানিফার অবস্থিতি জানতে পারলেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে সবিনয় প্রার্থনা করে তিন স্ত্রী মিলে স্বামীকে উদ্ধার করলেন।

হানিফা আবার যুদ্ধ করতে চাইলে তাঁর স্ত্রীরাই আগে সোনাভানের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নামলেন। বাইশ দিন মল্লিকার সঙ্গে, আটদিন আটরাত জৈগুনের সঙ্গে যুদ্ধের পর সমর্ত্তভানের কাছে পরাজয় মানলেন সোনাভান। পত্নীদের দৌত্যে হানিফা-সোনাভান পরিণয় ঘটল। দূতী বৃদ্ধাকে রাজত্ব দিয়ে তাঁরা মদিনা চলে গেলেন।

এই কাহিনী থেকে বোঝা যায় যে, হানিফার বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে কবি এই কাব্যরচনা করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে বীরত্বপ্রকাশ হয়েছে তাঁর পত্নীদের। হানিফা মস্ত বীর বটেন, কিন্তু সে বীরত্ব যতখানি মুখে, কাজে ঠিক ততখানি প্রকাশ পায় নি। বরঞ্চ হানিফা-চরিত্রের যে পরিচয় এই কাব্যে আমরা পাই, তাতে তাঁকে অনায়াসে কাপুরুষ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। নিজের পরাজয়ে বালসুলভ ক্রন্দন তো আছেই, এমন কি, স্ত্রীদের হাতে সোনাভানের পরাজয়ে তাঁর আক্ষেপ নিতান্তই গ্রাম্যতার পরিচায়ক:

'হানিফা কাঁদিয়া বলে সমর্ত্তভান তরে।
যার তরে এত দুঃখ খুন কৈলে তারে॥

সোনাভান আজ যদি মরে একেবারে।
সোনাভান মরিলে আমি বেহা করি কারে॥'

আর প্রকৃত কাপুরুষোচিত উক্তি করেছেন তিনি বিবাহের সময়েঃ

'হানিফা কহেন শুন সমর্ত্তভান বিবি।
সোনাভানের পাশে বৈসে দেখা যাক খুবি॥
বাঘের মতন চোখ আড়ে আড়ে চায়।
সোনাভান দেখে মোর প্রাণ উড়ে যায়॥'

তবে হানিফার কথায় আস্ফালন আছে, বাগ্‌যুদ্ধে অবশ্য সোনাভানও কম যান না। যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়ের কথা কাটাকাটির যে বিবরণ কবি দিয়েছেন, তাতে এঁদের ইতরতাই প্রকাশ পেয়েছে।[১]

'সোনাভান' কাব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে হিন্দু দেবদেবীর ইসলামভীতি। সোনাভান বন্দী হানিফাকে নিয়ে গেলেন শিবের সম্মুখে বলি দেবেন বলে। তখন,

'শিব বলে, সোনাভান শুন শীঘ্রগতি।
হজরত আলীর বেটা রছুলের নাতি॥
ইহাকে খাইতে দেহ যাহা খেতে চায়।
ইহাকে মারিতে পারে কে আছে দুনিয়ায়॥'

সোনাভান কালীর কাছে গেলে তিনি শিব-আলীর দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করলেনঃ

'শিব দেখে পলাইল আলী পাহালওয়ানে।
আমি গিয়া লুকাইয়া রহিলাম বনে॥

১। 'পাইনু শিকার আজ নাহি দিব যেতে।'—হানিফা
'চাকরের মত নও হতে চাও স্বামী।'—সোনাভান।
'চাপড়ে ভাঙ্গিব দাঁত শুনরে বেহায়া।'—সোনাভান।

বরুণ রাজার মেয়ে লইল ধরিয়া।
মুসলমান করে তারে কলেমা পড়িয়া ॥'

কবিকল্পনার বিচিত্র লীলা ছাড়া একে আর কি বলা যেতে পারে! এই বালকোচিত কল্পনাতেই কবির সন্তুষ্টি। ইসলামের মহিমা এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হল। যেমন করেই হোক না কেন, দেবপূজারিনী তো বিশ্বাসীরই জীবনসঙ্গিনী হলেন আর স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবও তো বিশ্বাসীদের কাণ্ডারীকে ভয় করেন!

কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও মনে না হয়ে পারে না যে, কবিমানসে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও হজরত আলীর অস্তিত্ব যেমন বাস্তব অর্থাৎ তাঁদের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে কবি যেমন নিঃসন্দিহান, তেমনি শিবের বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কেও তাঁর মনে একটা অস্পষ্ট বিশ্বাস আছে।

নয়

গরীবুল্লাহ্‌র আর একটিমাত্র কাব্যের কথা বললে আমাদের পরিক্রমা সম্পূর্ণ হতে পারে। সেটি হচ্ছে 'সত্যপীরের পুথি—মদন কামদেবের পালা'।

সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ যে একই ব্যক্তিত্বের প্রকাশভেদ মাত্র, সেকথা আমরা জানি। কিন্তু এই সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের উদ্ভব হল কিভাবে? 'স্কন্দপুরাণে' সত্যনারায়ণের কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা কতখানি মূল স্কন্দপুরাণের অংশ, তাতে সন্দেহ আছে। স্কন্দপুরাণের বঙ্গানুবাদক তারাকান্ত দেবশর্মা লিখেছেন: 'আমরা বঙ্গদেশের, বোম্বাই অঞ্চলের, অধিক সমগ্র ভারতের নানা পুথি আদর্শ করিয়া এই মহাপুরাণের অনুবাদকার্য্য করিয়াছি। পুস্তকবিশেষের পাঠাধিক্য আমরা পরিবর্জন করি নাই। এ স্থলে দৃষ্টান্ত দেখাই,—বঙ্গদেশীয় পুস্তকের মতে স্কন্দপুরানান্তর্গত রেবাখণ্ডের চারিটী অধ্যায়ে সত্যনারায়ণ ব্রতকথা নিবদ্ধ আছে। কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলের সংগৃহীত পুস্তকে সত্যনারায়ণের ব্রতকথার কোন উল্লেখ নাই।'[১] অতএব, এই অংশটুকু যে প্রক্ষিপ্ত এবং বাংলা দেশেই যে এই কাহিনীর

১। পঞ্চানন তর্করত্ন: স্কন্দপুরাণম্, অনুবাদকের বিজ্ঞাপন।

তথা পূজাপদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, বড়পীর হজরত আবদুল কাদের জিলানীর (রাঃ) কাহিনীই এদেশে সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের নামে প্রচলিত হয়েছে।[১] কিন্তু 'পীর বরহক' ও 'সত্যপীর' নামসাদৃশ্য সত্ত্বেও এই দাবীর ভিত্তি যথেষ্ট জোরালো ও যুক্তিসঙ্গত নয়। আসলে সত্যপীর বাংলা দেশেরই দেবতা—কোন বৈদেশিক ছাপ এর মধ্যে স্পষ্ট করে দেখা যায় না। সত্যপীর-চরিত্রসৃষ্টির পশ্চাতে লোকমানসের যে উপলব্ধি নিহিত ছিল তা এই যে, কলিযুগে প্রজার পাপের ফলে মুসলমানবেশে দেবতা মর্ত্যে আগমন করে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বাসীকে পুরস্কৃত করছেন। মুসলমান শাসনের পরিবেশ ও পীর ফকিরদের কেরামতির স্মৃতি সত্যপীরের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠালাভে সহায়তা করেছিল, এতে সন্দেহ নেই। এদিক দিয়ে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সত্যপীরের সাদৃশ্য আছে সত্য, কিন্তু সত্যপীর যে ধর্মঠাকুরেরই পরিণতি, সেকথা বোধহয় জোর দিয়ে বলা যায় না। ধর্মঠাকুরের কাহিনীগুলোয় হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধের যে ছায়াপাত ঘটেছে, তার বদলে সত্যপীর-উপাখ্যানগুলোয় ধর্মসমন্বয়েরই ইঙ্গিত পাই। এর সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা আছে শঙ্করাচার্যের 'সত্যপীরের পাঁচালী'তে ঃ

'ফকির বলেন দ্বিজ যাহ নিজপুর।
আমারে পূজিলে তব দুঃখ যাবে দূর॥
দ্বিজ বলে নিত্য পূজি শিলা নারায়ণ।
তাহা ভিন্ন না করিব যবন আচরণ॥
ফকির কহেন হাসি শুন দ্বিজবর।
পুরাণে কোরানে কিছু নহে মতান্তর॥
যেই রাম সেই সে রহিম এক হয়।
ত্রিভুবনে নাহি দুই জানিবা নিশ্চয়॥
বলিতে বলিতে কথা অখিলের নাথ।
শঙ্খচক্র গদা পদ্ম হইলা চারি হাথ।।'[২]

১। তসলিমুদ্দীন আহমদ : পীর, সত্যপীর, পীর বরহক, বড়পীর। র-সা-প-প, ১৩২২।
২। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী : সত্যপীরের পাঁচালী। সা-প-প, ১৩১৯।

এইজন্যে এই কাব্যগুলোয় সত্যপীর ও সত্যনারায়ণকে একই ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে এবং উভয় নামই ব্যবহৃত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি-সমন্বয়ের এটা একটা বড় উদাহরণ। মনে রাখতে হবে যে, সত্যপীরের শিন্নি দেওয়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই প্রচলিত ছিল।

ডক্টর সুকুমার সেন সত্যপীর-পাঁচালীকারদের যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে ভৈরবচন্দ্র ঘটকের কাব্যই (রচনা ১৭০০ খৃঃ) প্রাচীনতম বলে মনে হয়।[১] কিন্তু শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র সত্যপীর-পাঁচালীর যে পুথি ডক্টর এনামুল হক পেয়েছেন, তার রচনাকাল ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ।[২] এই আবিষ্কার ফয়জুল্লাহকে যেমন সত্যপীর পাঁচালীর আদি কবি বলে প্রতিষ্ঠিত করে, তেমনি সত্যপীর-কাহিনীর প্রাচীনতারও পরিচয় দেয়। পরে অনেকে হিন্দু ও মুসলমান কবি এই ধারায় কাব্য রচনা করেছেন—ভারতচন্দ্র তাঁদের একজন।

সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ-কাহিনীগুলো সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ধারায় স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে কথিত কাহিনীটিই ঘনিষ্ঠভাবে অনুসৃত হয়েছে। কলিযুগে নারায়ণের সত্যনারায়ণরূপে আবির্ভাব এবং করুণা ও ক্রোধ বর্ষণ করে তাঁর পূজো প্রতিষ্ঠার কাহিনীই এর উপজীব্য। অধিকাংশ কবি এই আখ্যানই অনুসরণ করেছেন, তবে পাত্রপাত্রীর নামে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটেছে। কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম রায়ের 'সত্যনারায়ণ-কথা' এবং দ্বিজ রামভদ্রের 'সত্যদেব-সংহিতা' এই ধারার কাব্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সত্যনারায়ণ-পাঁচালী একটু স্বতন্ত্র এবং উপাখ্যানপ্রধান। এখানে নানারকম কাহিনী অবতারণা করে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের প্রধান ভূমিকা দেখানো হয়েছে—নায়ক বা নায়িকাকে তিনিই সমস্যা

১। সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৮০৬।

২। মুহম্মদ এনামুল হক: পূর্বোক্ত, পৃ ৮৯-৯০।

সমাধানে সাহায্য করেছেন। যেমন, গরীবুল্লাহ্‌র আলোচ্য কাব্য এবং আরিফের 'লালমোন'।

ডক্টর সেন আরো একধরণের সত্যপীর-কাহিনীর উল্লেখ করেছেন, যেখানে 'সত্যপীরকে মানবসন্তান করিয়া কাহিনীতে ছদ্ম-ঐতিহাসিকতার আবরণ দিবার চেষ্টা আছে'। এর উদাহরণ, কৃষ্ণহরি দাসের 'বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি'।[১]

গরীবুল্লাহ্‌র 'সত্যপীরের পুথি ঃ মদন-কামদেবের পালা'র কাহিনী সংক্ষেপে এই ঃ হুগলী-চন্দননগরের বিপত্নীক বণিক জয়ধর মৃত্যুকালে পুত্র মদন ও কামদেবকে ডেকে অপর পুত্র সুন্দরকে সমর্পণ করে দেন (এই সুন্দরকে তিনি লাভ করেছিলেন সত্যপীর-আরাধনা করে)। কিছুকাল পর মদন-কামদেব বাণিজ্যযাত্রায় বেরোবার আগে সুন্দরের হাতে উভয়ের স্ত্রীদের ভার দিয়ে বলে গেলেন 'অবোধ নারী জাতি বুদ্ধি ভাল নয়'। সুন্দর ভাইদেরকে এক সোয়াপাখী আনতে বলল।

এদিকে সুন্দরের ভ্রাতৃবধূ সুমতি ও কুমতি ছিলেন কাউরের (কামরূপের) ডাকিনী। মন্ত্র পড়ে গাছকে পবনগতি করে তাঁরা রাতে কামরূপ যেতেন, সকালে ফিরে আসতেন কামিক্ষে (কামাখ্যা) দেবীর পূজো সেরে। সত্যপীর মাঝরাতে সুন্দরের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়ায় সে ব্যাপার বুঝতে পারল। ধরা পড়ার ভয়ে সুমতি-কুমতি রক্তবাণ হেনে তাকে নিহত করে গহন বনে ফেলে দিলেন। আবে জমজম খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন সত্যপীর। দ্বিতীয়বার সুন্দরের মাথা কেটে কলসীতে ভরে বনের মধ্যে প্রোথিত করে দিলেন ভ্রাতৃবধূরা ঃ এলাহি ভেবে সত্যপীর ধড়মুণ্ড জুড়ে দিলেন। তৃতীয়বার সুন্দরকে সাতখণ্ড করে ফেললেন ভ্রাতৃবধূরা ঃ আবার তাকে বাঁচিয়ে দিলেন সত্যপীর, তারপর তাকে নিয়ে এলেন কামাখ্যায়। তাঁর আদেশে কামরূপরাজ গিরিধরের কন্যা বিমলাসুন্দরী বরমাল্য দিল সুন্দরকে। আবার, সত্যপীরের আদেশে প্রভাত হবার আগেই সুন্দর নরপরিণীতাকে ছেড়ে দেশে ফিরে এল। সুমতি-কুমতি তাকে উড়িয়ে দিল সোয়াপক্ষী করে।

১। সুকুমার সেন ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ৮১৯-২২।

সুন্দরকে না দেখে বিমলা বিলাপ করতে লাগল—এমন সময়ে আঁচলে তার পরিচয়পত্র পেয়ে সে স্বামীর দেশে চলে এল, কিন্তু স্বামীকে পেল না। শ্বেতমক্ষিকার ছদ্মবেশে সত্যপীর তাকে শিন্নি মানতে বললেন। ওদিকে সত্যপীরের পরামর্শে আকটিনন্দনেরা সোয়াপক্ষীরূপ সুন্দরকে ধরে হাজার টাকায় মদন-কামদেবের কাছে বিক্রি করল। মদন-কামদেব সুন্দরকে না দেখে পাখীটা দিয়ে দিলেন বিমলাকে। সত্যপীরের নির্দেশানুযায়ী কাজ করে সোয়াপক্ষী আবার সুন্দর হয়ে গেল। তখন দুই ভাই সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে সুমতি-কুমতিকে জীবন্ত সমাধি দিলেন আর সাড়ম্বরে দিলেন সত্যপীরেব শিন্নি।

অন্যান্য সত্যপীর-পাঁচালীর তুলনায় আলোচ্য কাব্যে নতুনত্ব কিছু নেই। অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার চাপে চরিত্রগুলো মানবীয় গুণ হারিয়ে সত্যপীরের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। অতিশয়োক্তি ও অসঙ্গতি অনেক আছে। যখন বিমলা সুন্দরের অন্বেষণে বের হচ্ছে, তখনঃ

'কাঁদেন কন্যার মাতা অমলাসুন্দরী।
রাণীর কাঁদনে কাঁদে নাগরিয়া নারী।'

আবার, সুন্দরকে না পেয়ে যখন মদন-কামদেব শোক করতে লাগলেন, তখনওঃ

'নগরিয়া নারী যত কাঁদে তারা শত শত।'

আর বিমলা—যার বিবাহ হল ব্রাহ্মণমতে—সে দুঃখপ্রকাশ করছে এই বলেঃ

'হেন দশা কেন মোর করিল খোদায়।'

কবিত্বের অবকাশ এ কাব্যে নেই—বক্তব্যের প্রকাশ আছে মাত্র। সে বক্তব্যও অতি স্থূলঃ

'আটকুড়ার পুত্র হয় যদি সত্য ভাবে।
নির্ধনের ধন হয় পীরের ছববে॥
একিন করিয়া যাহা করিবে মননা।
নিয়ত হাছিল হবে পীরের কামনা॥'

দশ

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ এবং সৈয়দ হামজা মিশ্র ভাষারীতির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কবিত্বের বিচারে তাঁদের স্থান খুব উঁচুতে নয়। তার কারণ, তাঁদের কাব্যাদর্শ খুব উন্নত ছিল না এবং যে যুগে তাঁরা কাব্যসৃষ্টি করেছিলেন, সেযুগে উন্নত কাব্যাদর্শের পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন ছিল।

বাংলার এক যুগসন্ধিক্ষণে এই কাব্যধারার সূচনা হয়েছিল। নবাবী আমলের পতন ও কোম্পানী শাসনের অভ্যুদয়ের কাল হচ্ছে এর পটভূমি। নবাবী আমলের শাসনব্যবস্থাগত শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের অত্যাচার অবাধ হয়ে উঠল ১৭৬৫ সালে কোম্পানীর দেওয়ানীলাভের পর থেকে। দ্বৈতশাসনের কুফলে দেশময় অরাজকতা ও অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল —যার পরিণতি হল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও লাখেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াপ্তির আগেও রাজস্ব নিয়ে নানারকম পরীক্ষানিরিক্ষা জনসাধারণের দুর্দশা বৃদ্ধি করেছিল মাত্র। অতএব, সে ছিল এক সর্বব্যাপী ভাঙনের যুগ— সেই ভাঙনে আগেকার সাংস্কৃতিক ভিত্তিটাই ধ্বসে গিয়েছিল। নবাবী আমলে যে রুচিবিকৃতির সূত্রপাত হয়েছিল, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার ছাপ আছে; কোম্পানী আমলে যখন জীবনে নিশ্চয়তাবোধের অভাবে মানুষ পীড়িত, তখন সে বিকার আরো ব্যাপক হয়ে উঠল, রামপ্রসাদের মতো ভক্ত কবির রচনায়ও তার পরিচয় আছে। কিন্তু যথাযথভাবে সে পরিচয় লাভ করা যায় আখড়াই, হাপ-আখড়াই, কবির লড়াই, খেউড়, তরজা প্রভৃতির মধ্যে। স্থায়ীমূল্যের দিকে তখন লক্ষ্য ছিল না কারো—সাময়িক প্রয়োজননিবৃত্তি, চাপা উল্লাসের উত্তেজনাই সবার কাম্য ছিল। এই হল কোম্পানী আমলের নাগর-সংস্কৃতির স্বরূপ।

এত দুঃখদৈন্যদুর্গতি সত্ত্বেও লোকসাধারণের রসপিপাসা নির্মূল হয়ে যায় নি। সেই পিপাসানিবৃত্তির প্রয়াসেই মিশ্র ভাষারীতির কাব্যসৃষ্টি। যাঁদের জন্য এইসব কাব্য রচিত হয়েছিল, তাঁরা নগরের সাধারণ শ্রেণীর মানুষ—শিক্ষা সংস্কৃতিগত পটভূমি তাঁদের ছিল না, তাঁরা ছিলেন স্থূলরুচির রসিক। তাঁদের রসপিপাসার পরিতৃপ্তি ছাড়াও অন্য একটি মনোভাব এই কাব্যসৃষ্টির পশ্চাতে

সক্রিয় ছিল, সেকথা বলেছি। লৌকিক হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইসলামের সংঘাতে যে মনোভাব থেকে জন্মলাভ করেছিল বাংলার মঙ্গলকাব্য, সেই মনোভাবের সঙ্গে তার তুলনা চলে। অর্থাৎ নিজধর্মের শক্তির কাছে বহিঃশক্তির তুচ্ছতা প্রদর্শন তার উদ্দেশ্য। অবশ্য 'নিজধর্ম' বলতে বাহ্যত ইসলাম বোঝালেও, প্রকৃতপক্ষে কবির বিশ্বাসের ইসলাম বোঝায়—ইসলামের সত্যকার আদর্শ ও শিক্ষার সঙ্গে এই বিশ্বাসের পার্থক্য আছে। আসলে মুসলিম শাসনকালে যাঁরা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁরা আগেকার ধর্মবিশ্বাস বা মত ত্যাগ করলেও সংস্কার বা মন বদলাতে পারেন নি। ফলে বাংলায় এসে ইসলামের একটা রূপান্তর ঘটেছিল ঃ মুসলিম-মানস হিন্দু দেবদেবীদের আত্মসাৎ করে নেয়; তাছাড়া, মুসলমান পীর-ফকিররা নানা কেরামতি দেখিয়ে লোকমানসে প্রতিষ্ঠালাভ করে এই রূপান্তরে সহায়তা করেন এবং নিজেরাও মঙ্গলকাব্যের ছোটখাটো দেবদেবীর আসন অধিকার করে বসেন। বর্তমান প্রসঙ্গের সত্যপীর, বড় খাঁ ও বদর পীরের সৃষ্টি এভাবেই হয়েছিল। আবার, তুলনামূলকভাবে নিজ বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বীরচরিত্রও গড়ে ওঠে—যেমন, হামজা, আলী ও হানিফা। লৌকিক ধর্মবিশ্বাস, তার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের আগ্রহ ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার বাহুল্যের দিক দিয়ে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে আলোচ্য কাব্যধারার ঐক্য আছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর তুলনায় মানুষের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতার যে স্বীকৃতি আছে এবং বাঙালী সংসারের হাসিঅশ্রুমিশ্রিত যে রূপটি সেখানে ধরা পড়েছে, সেই মানবস্বীকৃতি ও সমাজচিত্র এতে নেই। এখানেই মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের মৌলিক পার্থক্য এবং এখানেই মঙ্গলকাব্যের তুলনায় এই কাব্যধারার দৈন্য।

এর অবশ্য কারণ ছিল। সেই দুঃখদুর্দশার দিনে মানুষের জীবনে কিছুটা আত্মবিশ্বাসহীনতা ও বাস্তববিমুখীনতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। তাই কল্পনার ঐশ্বর্য দিয়ে বাস্তবের তুচ্ছতা ঢাকার প্রচেষ্টায় কবির রচনায় সমকালীন সমাজ অবহেলিত হয়েছে। নারীদের সম্বন্ধে যে অবিশ্বাসের মনোভাব এঁদের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে, তার মূলেও বোধ করি সেই রাষ্ট্রিক নৈরাজ্যের দিনে সংসারের সর্বাঙ্গীন বিশৃঙ্খলা ও মানুষের আত্মপ্রত্যয়ের অভাবই নিহিত ছিল।

অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্যে রচিত হওয়া সত্বেও পূর্বোক্ত কারণে পূর্ববঙ্গের লোকগীতিকার সঙ্গেও এর মিল হয় নি। লোকগীতিকার উপজীব্য সাধারণ মানুষের সহজ জীবনপ্রবাহের এক একটি তরঙ্গ—কবির স্বভাবকবিত্ব, মানবমনের অনাড়ম্বর প্রকাশ তার বৈশিষ্ট্য। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে বর্ণিত হয়েছে অলৌকিক শক্তিসমর্থিত অসাধারণ ও অস্বাভাবিক জীবনধারার বীরোচিত বিকাশ—তার কবিত্বও আভরণময়, রীতিনীতি-নির্দেশিত। অনেক ক্ষেত্রে কবি সে রীতি অনুসরণ করেন নি—কিন্তু তাও কৃত্রিমতার প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে নয় অথবা জীবনের সরল সৌন্দর্যের সন্ধানলাভ করে নয়— শক্তির দৈন্যই তার কারণ।

তাই মিশ্র ভাষারীতির কাব্য মঙ্গলকাব্য ও লোকগীতিকার মতো সার্বজনীন হতে পারে নি— ভাবে সম্পূর্ণত ইসলামসম্মত না হয়েও অশিক্ষিত মুসলমান পাঠক সমাজেই তার আবেদন সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। শিক্ষিত মুসলমান সমাজেও তার আদর হয় নি বলা চলে এবং কাব্যরুচির পতন না হওয়া পর্যন্ত মিশ্র ভাষারীতির কাব্য আমাদের ঐতিহাসিক কৌতূহলের বিষয় হয়েই থাকবে।

গরীবুল্লাহও আমাদের ঐতিহাসিক কৌতূহলের সামগ্রী। তিনি প্রায় ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক—কিন্তু সেই কবিত্ব ও বৈদগ্ধ্য তাঁর সাধ্যাতীত ছিল: রায়গুণাকরের পাশে সায়ের তাই ম্লান। রামপ্রসাদেরও তিনি সমকালীন—কিন্তু যে আত্মভাবমুখীন গীতিরচনার জন্যে কবিরঞ্জনের প্রতিষ্ঠা, গরীবুল্লাহর কাব্যে সেই আত্মভাবতন্ময়তার একান্ত অভাব। তিনি যে ধারায় কাব্যসাধনা করেছেন, তা আত্মভাবপরায়ণতার বিপরীত কোটির। রোমান্টিক প্রণয়কাব্য হিসেবে তাঁর 'ইউসুফ জেলেখা' উল্লেখযোগ্য রচনা—এটাই তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। কিন্তু অন্যান্য কাব্যে সেই শক্তির পরিচয় বিতর্ক ও অনুসন্ধানের বিষয়।

মিশ্র ভাষার সাধারণ লক্ষণগুলো ছাড়া গরীবুল্লাহ্‌র ভাষার কোন বৈশিষ্ট্য নেই। দু একটি শব্দের ব্যবহার কবির অজ্ঞতার পরিচায়ক। যেমন, 'সোনাভানে':

'গাথিয়াছে পাথরেতে সোনা রূপার থাম তাতে
রতন কাঞ্চন দিয়া তায়।'

এখানে 'সোনা' ও 'কাঞ্চন' বলতে কবি দুটি ভিন্ন বস্তু বুঝিয়েছেন।

পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ কবি ব্যবহার করেছেন, মৌলিকতা বা বিশেষ কোন কৃতিত্বের নিদর্শন সেখানে নেই।

উপমা-উৎপ্রেক্ষায় চমৎকারিত্বের পরিচয় আছে কদাচিৎ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবি গতানুগতিক। বিশেষ করে তাঁর যুদ্ধকাহিনীর কাব্যগুলো সম্পর্কে সেই মন্তব্য করা চলে, ফিরদৌসীর 'শাহনামা'র সমালোচনায় ব্রাউন যা বলেছিলেন: 'But the similies employed are also, as it seems to me, unnecessarily monotonous: every hero appears as "a fierce, war-seeking lion", "a crocodile", "a raging elephant" and the like, and when he moves swiftly, he moves "like smoke", "like dust", or "like the wind".'[১]

ফকির গরীবুল্লাহ্‌র প্রতিভা ছিল, পর্যাপ্ত শিক্ষা ছিল না। কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা তাঁর ছিল, কিন্তু লোকমনোরঞ্জন ছিল তাঁর আশু লক্ষ্য। আর সে লোকসমাজের পরিচয় তো আগেই দিয়েছি। তাই গরীবুল্লাহ্ জনপ্রিয় হলেন, কিন্তু একজন প্রথম শ্রেণীর কবি হতে পারলেন না। তবে একটি বিশেষ কাব্যধারার পথকর্তা হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করবেন, এটুকুই আমাদের সান্ত্বনা।

১। Browne : Literary History of Persia, Vol II, p 142.

গ্রন্থপঞ্জী

বইতে মুদ্রিত লেখকের নামানুযায়ী

ক. মূলগ্রন্থ

১। মুনশী ওয়াজেদ আলী সাহেব: সত্যপীরের পুথি—মদন কামদেবের পালা। সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৬।

২। ছৈয়েদ হামজা মরহুম সাহেব: ছহি সোনাভান। সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৬।

৩। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও তারাকান্ত দেবশর্মা অনূদিত: স্কন্দপুরাণম্। বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৮।

৪। মুনশী ফকির মোহাম্মদ : ইউছুফ জেলেখা। সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৫।

৫। মুনশী ফকির মোহাম্মদ : ছহি সৌনাভান। হামিদীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪১।

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত : ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৭।

৭। মীর মশাররফ হোসেন : বিষাদ সিন্ধু। প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

৮। মুনশী মোহাম্মদ এয়াকুব : মোক্তাল হোছেন—জঙ্গনামা। হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪১।

৯। রামপ্রসাদ সেন : গ্রন্থাবলী। তৃতীয় বসুমতী সংস্করণ, কলিকাতা।

১০। সাহা গরীবুল্লা ও ছৈয়দ হামজা : ছহি বড় আমির হামজা। গাওছিয়া লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৩৬।*

খ. সমালোচনা ও ইতিহাস

১১। আহমদ শরীফ সম্পাদিত ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত : পুথি-পরিচিতি। বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

১২। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬।

১৩। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : মুসলিম বাঙলা সাহিত্য। পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৫৭।

১৪। ডক্টর সুকুমার সেন : ইসলামি বাংলা সাহিত্য। বর্ধমান সাহিত্য সভা, বর্ধমান, ১৩৫৮।

১৫। ডক্টর সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড। মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৪৮।

১৬। ডক্টর সুকুমার সেন : মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী। বিশ্বভারতী, ১৩৫২।

১৭। Blumhardt, J. F. : Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum. London, 1886.

১৮। Browne, E. G. : A Literary History of Persia, 4 vols. University Press, Cambridge, 1956.

* অধ্যাপক আহমদ শরীফের সৌজন্যে।

১৯। Chatterji, Dr. Suniti Kumar : ODBL = The Origin and Development of Bengali Language, Part I. Calcutta University Press. 1926.

২০। Dattā, Dr : Kali Kinkar : Alivardi and his Times. University of Calcutta, 1939.

২১। De, Sushil Kumar : History of Bengali Literature in the Nineteenth Century (1800-1825). University of Calcutta, 1919.

২২। Gibb, H.A.R. & Kramers, J.H. ed. : Shorter Encyclopedia of Islam. E.J. Brill, Leiden, 1953.

২৩। Long, J. : A Descriptive Catalogue of Bengali Works. Calcutta, 1855 (ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে গ্রথিত)

২৪। O'Malley, L. S. S. & Chakravarti, Monmohan : Bengal District Gazetteers : Hooghly, Calcutta, 1912.

২৫। Peterson, J.C.K. : Bengal District Gazetteers : Burdwan. Calcutta, 1919.

২৬। Sarkar, Sir Jadunath. ed. : History of Bengal, Vol II. University of Dacca, 1948.

গ. সাময়িকপত্র (বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ)

২৭। দিলরুবা। ঢাকা, ১৩৫৭, ১৩৬২।

২৮। মোহাম্মদী। ঢাকা, ১৩৬১।

২৯। র-সা-প-প = রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। রঙ্গপুর, ১৩২২।

৩০। সা-প-প = সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। কলিকাতা, ১৩০৩, ১৩০৮, ১৩১৯, ১৩২২, ১৩২৩, ১৩২৪।

৩১। সাহিত্য পত্রিকা। ঢাকা, ১৩৬৪।

৩২। JASB = Journal of the Asiatic Society of Bengal. Calcatta, 1847, 1870, 1874, 1925,

৩৩। Proc. ASB = Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Calcatta, 1870.